আশ্বিন ১৪২৩
১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

OCTOBER 2016
VOLUME 10 ISSUE 1

# শারদীয়া লিপিকা

# SHARODIYA LIPIKA

## DESHANTARI OF OTTAWA CARLETON

**EDITOR**
Jharna Chatterjee

**COORDINATOR**
Aditya Chakravarti

**COVER DESIGN**
Oishee Ghosh

**WEB MASTER**
Shomesh Roychoudhury

# Clouds

Tanima Majumdar

## সম্পাদকীয়/Editorial

প্রিয় লিপিকার পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ,

দুর্গাপূজা আসছে, আমাদের মনে বাজছে আগমনীর সুর, শুনতে পাচ্ছি ঢাকের বাজনা। এ দেশের গোলাপী-লাল-সোনালী-ঝলমলে মেপল পাতা শিউলির মিষ্টি, পবিত্র সুবাস না পাওয়ার দুঃখ ভোলাতে পারে না ঠিকই, কিন্তু সবাই মিলে কয়েকটা দিন আনন্দে কাটবে মায়ের বন্দনায়,হাসি-গল্প-নাচে-গানে, সেই প্রত্যাশায় আমরা সত্যিই নূতন উদ্দীপনা অনুভব করি। আর তার সাথে সাথে আমাদের সাধের 'লিপিকা'র বার্ষিক সংখ্যা প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় কলম, তুলি, ক্যামেরার সঙ্গে সৃজনী স্পৃহা মেলাই।

এই বছরেও অনেকে দিয়েছেন লেখা আর ছবি, নিজেদের নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য ও চিন্তা ভাগ করে নিয়েছেন লিপিকা-অনুরাগী-অনুরাগিনীদের সাথে। আমাদের কিশোরী কন্যা ঐশী এ-বছর এঁকেছে লিপিকার প্রচ্ছদপট – তাতে গর্ব অনুভব করছি। ঐশী আর ঋত তাদের লেখা আর ছবিও পঠিয়েছে। ছোটদের কাছ থেকে আরও লেখা এবং ছবি পেলে আরও খুশি হতাম।

লিপিকা'র পক্ষ থেকে শুভকামনা জানাই সবাইকে। মঙ্গলময়ী মা দুর্গা যেন দূর করে দেন সব দুঃখ ও অকল্যাণ, যেন সবার মঙ্গল সাধন করেন, সবাইকে শান্তি, সুস্থতা ও সুখের বর দেন এই প্রার্থনা করি।

ডক্টর ঝর্ণা চ্যাটার্জী, লিপিকা সম্পাদিকা

Dear Lipika readers,

With the advent of Durga Puja, there is hardly any Bengali person living abroad who does not feel a tug at the heart-strings and reminisce. Here, instead of enjoying the pure fragrance of Shiuli in early morning we see Maple leaves turning colour. We listen to Agomoni songs only in our memories. The gradually plunging temperatures accompany the noisy Southern flight of Canada geese. All around, there is a feeling of anticipation in the air – the great white frosty giant is coming. However, that does not dampen our spirit as we celebrate Durga Puja and turn our attention to the much-anticipated days of collective joy and togetherness before the snow flies. And this is also the occasion when we put our pens, painting brushes, cameras and creative talents to the best use, and publish Lipika, our much-beloved annual e-magazine.

I am happy to say that Lipika is thriving with the best wishes and efforts of many. Deshantari members, including young contributors Oishee and Reeto, have enriched Lipika by sharing their experiences and opinions through stories, articles, or pictures. This year our young daughter Oishee has created the cover page, and made us quite proud. Greater participation from the younger generation would be desirable.

On behalf of the Lipika team, I wish all of you our very best. May Ma Durga's blessings protect you from all evil, sorrow and suffering, and bring you peace, health and happiness.

Dr. Jharna Chatterjee,

Editor, Lipika

---

**PLEASE NOTE: Lipika team and Deshantari are not responsible for any opinion expressed by the writers in the content of this magazine. They reflect the writers' own views. Any similarity between the writings and actual incidents is co-incidental.**

**বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** লিপিকা কর্মীবৃন্দ ও দেশান্তরী এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখক-লেখিকাদের নিজস্ব মতামতের বা অন্য কোন বিষয়-বস্তুর জন্য দায়ী নন। কোনও লেখার সাথে বাস্তব ঘটনার মিল থাকলে সেটা কাকতালীয়।

# ****** সূচীপত্র Contents ******

SHARODIYA

লিপিকা

আশ্বিন ১৪২৩ ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

October 2016 Volume 10 Issue1


| | | |
|---|---|---|
| Clouds | Tanima Majumdar | 1 |
| সম্পাদকীয় - Editorial | ডঃ ঝর্ণা চ্যাটার্জী | 2 |
| সূচীপত্র - Contents | | 3 |
| বোবা ঠাকুর | অমর কুমার | 4 |
| ছায়ার পাখী | নন্দিতা ভাটনাগর | 8 |
| একটি অনুরোধ | সুপর্ণা মজুমদার | 16 |
| খোশ-গল্প | আদিত্য চক্রবর্ত্তী | 18 |
| কিরণশশী | মদনমোহন ঘোষ | 21 |
| লুখ্যি | বেণু নন্দী | 23 |
| Recipes | Sharmistha Chatterjee | 25 |
| Rules of the game | Oishee Ghosh | 26 |
| Sunya and purnata | Dr. S.K. Banerjee | 27 |
| অথ বিম্বাধরোষ্ঠীকথা | বাসবী চক্রবর্তী | 29 |
| বাঙালীর ব্যবসা | ডঃ অরুণশংকর রায় | 31 |
| হেসে নাও দুদিন বৈ তো নয় | সংগ্রহ | 32 |
| Morning with a koala | Dr. Nirmal Sinha | 34 |
| In the steppes of central Asia – Samarkand | Subhalakshmi Basu Ray | 36 |
| Autumn colours | Yogadhish Das | 39 |
| পেরু দেখা | ডঃ ঝর্ণা চ্যাটার্জী | 41 |
| ভিয়েতনামে লাল সেলামে | গৌর শীল | 58 |
| Bishnupur – the town of terracotta temples | Dr. Subhash C. Biswas | 65 |
| Himachal Pradesh II. Shimla where rhododendrons bloom | Dr. Subhash C. Biswas | 72 |
| Cleolpatra in acrylic | Dr. Arun Shankar Roy | 83 |
| Life on a lilypad | Reeto Ghosh | 84 |
| A Collage Travel Moments in Time | Aditi Chakravarty | 85 |
| Mer bleue bog | Tanima Majumdar | 94 |
| Remembering Harambe | Reeto Ghosh | 95 |

# বোবা ঠাকুর (রম্যরচনা)

ড. অমর কুমার

প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে ভরা হ্যামিলটন শহরটা আমার বেশ ভালো লাগে । কয়েক বছর থাকাকালীন ওখানকার বাঙ্গালী মহলে বেশ পরিচিতি হয়েছিল । বিশেষ করে দুর্গা পূজোর দিনগুলোতে ভারি মজা হত। যা সব ঘটনা ঘটতো, এখনও মনে করলে হাসি পায়। সেবার সপ্তমীর দিনে সন্ধ্যা-আরতির মাঝখানেইতো ব্যাপারটা ঘটেছিল। আরতি দর্শনের লোভে সন্ধ্যার মুখে অনেকেই মণ্ডপে এসে পৌঁছেছিলেন । সকলেই চোখে লাগা জমকালো শাড়ী কাপড় জামা পাঞ্জাবীতে সেজেছেন । গোটা বছর পরে মন দিয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি সহ আরতি উপভোগ করছেন । কাঁসর, ঘণ্টা, শাঁখ ও ঢাকের আওয়াজে বেশ গুরু গম্ভীর পবিত্র পরিবেশ। হঠাৎ খিল খিল করে আওয়াজ, হাসিটা চাপতে চাপতে এগারো বছরের রিমি ওর মাকে বলছে , “এমা, কার্তিক ঠাকুরের ময়ূরের লেজ কাটা” । চোখ পাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জয়তী মেয়ের মুখে হাত চাপা দিল, “চুপ, চুপ একদম চুপ” । জয়তী মেয়েকে নিয়ে একাই দিদির কাছে হ্যামিলটনে বেড়াতে এসেছে দিল্লী থেকে । এই প্রথম বিদেশে আসা ও পূজো দেখা । মেয়ের মন্তব্যে জয়তী বেশ লজ্জিত। মুখ চাপা অবস্থাতেই রিমি বলে চলেছে,”সত্যি মা, ময়ূরটার কোনও লেজই নেই”।

মুখ চাপা দিলেও কথাটা আশেপাশের আরও কয়েকটা কান ও দৃষ্টি ছুঁয়েছে । শাঁখ ও ঢাকের আওয়াজের মধ্যেই কৌতূহলী কিছু মাথা ও মুখ ভাল করে ময়ূরের দিকে নজর ছড়াল, কেউ কেউ কথাটা একানে নিয়ে অন্য কান দিয়ে বার করে দিল । “সত্যইতো লেজটা দেখা যাচ্ছে না, গেল কোথায়, কবে থেকে নেই?” গলা নামিয়ে বয়স্ক সমীরবাবু বললেন পুরোহিত তরুণ বাবুকে। ভ্রু কুঁচকে তিনি ভালকরে পর্যবেক্ষণ করলেন আরতির শেষে । পূজোর কর্মকর্তাদের কানেও গেল, কিন্তু কারো কাছে কোনো জবাব নেই । সবাই না শোনার ভান করে এড়িয়ে গেল । কার আর সময় আছে এসব নিয়ে ভাববার । প্রসাদ পর্ব শেষ হলেও প্রশ্নগুলো কারো কারো মনে জড়িয়ে থাকলো ।

পরের দিন মহা অষ্টমীর পূজো, সাত সকালেই মহিলারা স্নান সেরে নতুন শাড়ী পরে যে যার কাজের দায়িত্বে মণ্ডপে পৌঁছে গেছেন । মা দুর্গার মালাতে ফুল পরাতে পরাতেই মালিনী কথাটা পাড়লো, “শুনেছো

সব, আমাদের কার্তিকের বাহনের লেজ নেই । যারা গত সন্ধ্যার ঘটনাটা জানে না, ভ্রূ কুঁচকে রইল । মালিনী বেশ রসিয়ে রং চড়িয়ে কালকের ঘটনাটা বিস্তারিত ভাবে জানালো। নমিতাদি জানিয়ে দিলেন যে আজ সকালেই তিনি ভাল করে পরীক্ষা করেছেন আর "সত্যই তোমাদের ময়ুরের গোটা লেজটাই নেই" । বললেন, "বছর বছর সেই একই প্রতিমা, কবেই হয়তো আনা নেওয়া করতে করতে খসে গেছে" ।

টেবিলের উল্টো দিকে একমনে প্রসাদের জন্য আপেল কুঁচোছিল বিপাশা । কথাটা কানে যেতেই ফোঁস করে উঠলো, "তাই বলছো, কেন গতবারই তো মা দুর্গার অস্ত্রগুলো উলটো পালটা লাগানো ছিল, খেয়াল আছে? "তাই নাকি ?" আকাশ থেকে পড়লো আনন্দী, "গত বছর ছিলাম না, তাই জানি-ও, না" ।"হ্যাঁ হ্যাঁ , আমিও জানি, নবমীর পূজো যখন প্রায় শেষ তখনো ব্যাপারটা জানাজানি হ'ল । মায়ের চক্রটা বাঁ হাতে ধরা ছিল, আর একটা অস্ত্র তো লাগানোই ছিল না" । হাসতে হাসতেই ফোড়ন কাটলো টরন্টোর রুপালী । "সেই অবস্থাতেই পূজো হল", আনন্দী তো বেশ অবাক। "আর নয়তো কি, কেউ কি আর মূর্তির দিকে তাকায় আজকাল", বললো বিপাশা । এই সব কথাবার্তার মাঝখানে এক ঝাড়ি ফুল আর একরাশ রূপ নিয়ে ঝুপ করে এসে দাঁড়াল হৈমন্তী । দুর্গার বড় মালাটা গাঁথার দায়িত্ব হৈমন্তীর । চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়া চেঁচালো- "গত দু বছর কে মালা গেঁথেছিলো জানিনা, একদম ফ্যারফেরে ছোট, মায়ের গলায় এত বিশ্রী বেমানান লাগছিল । এরা ভাল ফুলও বেশী করে কেনে না"।

"হৈমন্তী, দেখিস যেন এ বছর মালাগুলো বড় আর দেখতে ভাল হয়" - মুখ বেঁকিয়ে ফুট কাটলো অনন্যা । "বছরে তো কদিন মাত্র মায়ের গলায় মালা পরানো হয়" । বিপাশা গলা ঝাঁঝালো,"মায়ের বেদীর উপর কিছু mums বা plants থাকলে কত ভাল দেখায়" । বললো বৃন্দা , "কমিটি টাকা-পয়সা ছাড়লে তবে, না" । কস্তূরী মনে পড়িয়ে দিল, "কেন, মায়ের গায়ে পুরানো বাক্স বন্দী গন্ধ ছাড়ে এমন শাড়ীগুলো বছরের পর বছর ব্যবহার করা হয়, না?। তার খবর কে রাখে। আমরা সবাই নতুন ঢাকাই গাদোয়াল জামদানী সালোয়ার কুর্তিতে পূজো দেখতে আসি আর মা সেই পুরনো শাড়ীই পরে থাকেন । প্রতি বছর মায়ের অঙ্গে নতুন শাড়ীও জোটে না। কি লজ্জার কথা" । মাথা নামাল সবাই ।

অষ্টমীর দুপুরের ভোগ রান্নার দায়িত্বে এক দল মহিলা ও পুরুষ । Leader এর ভূমিকায় রাশভারী দেবাঙ্গনা বসু । গত সন্ধ্যার ঘটনার আলোচনা সেখানেও চলছিল । আলুর খোসা ছাড়াতে ব্যস্ত অপর্ণা, কিন্তু মুখ ছোটাতে দেরী করে না । হাসতে হাসতে বললো, "এখানে পূজোতে যা সব চলে ? সেবারে তো পুরুত মশাই পূজোর মাঝে ঘুমিয়েই পড়েছিল। যা সব বয়স ঘুমিয়ে পড়াটা স্বাভাবিক, হয়তো রাত্রে ঘুম হয় নি" মন্তব্য কাটলো সুরূপা । এক লহর উচ্চ হাসিতে কিচেন, ঘর ভরে গেল । ধমক দিলেন দেবাঙ্গনা ,"চুপ চুপ, কি ইয়ারকি হচছে সব?"

মুখরোচক সরস কথা বার্তা, ধমকালে কে আর শোনে কার কথা। বেগুনে ছুরি চালাতে চালাতে ব্রততী গলা চড়ালো,"বছর তিন আগে কানে খাটো পুরোহিতকে বলা হল সাদা মালাটা সরস্বতীর গলায় যাবে । উনি দিলেন লক্ষ্মীর গলায়"। বৃন্দা অঙ্গ দুলিয়ে চাপা গলায় বললো, "হয়তো লক্ষ্মীর সঙ্গে পে.রে.ম"। আবার হাসি এক ঘর, ঢলে পড়লো একে অন্যের গায়ে ।

শালিনী সব শুনে মনে করিয়ে দিল,"মনে আছে একবার, অঞ্জলি দিতে দিতে পুরুত মশাই মন্ত্রই ভুলে গেলেন" । কি বিড়ম্বনা, ভাবো তো"। হ্যাঁ, হ্যাঁ সেবারইতো শিশিরদা পুজো করছিলেন, মনে করিয়ে দিল সুরূপা । গম্ভীর, বেশ রাশভারী নমিতাদি চুপ করে ছিলেন এতক্ষণ । মুখ খুললেন, "এখানে এত বছর ধরে পূজো চলছে, এটাই বড় কথা । মা দুর্গা তো পুজো নিতে দ্বিধা করেন না"। চুপ করে শুনলো সবাই । "তা যা বলেছো, নমিতাদি", শূন্যে ছুঁড়ে দিল শালিনী । "এই টুকু নিয়েইতো এখানে এই বিদেশ বিভুঁয়ে বেঁচে থাকা"।

রান্নার চালাতেও এক আলোচনা, এক হাসি ঠাট্টা চলছে । পূজোতে কোথায় কবে কি খুঁত হয়েছে এই নিয়ে রকমারি হালকা-পলকা কথা বার্তা। ঋতিকা কোমরে কাপড় জড়িয়ে কড়াইতে এক মনে মুগ ডাল ভাজছিল, বেশ মোটাসোটা বলা যায় । হাসতে হাসতে বললো, "আজকালতো ধূপ ধূনোর পাট উঠেই গেছে । city নাকি allow করছে না । ধূপ ধুনো অগরু, চন্দনের গন্ধ ছাড়া মায়ের পূজো হবে কেউ ভাবতে পারে দেশে? তাই বলছো তোমরা, চোখ পাকালো বিদিশা, পনীর ভাজতে ভাজতে "কতবার পূজো আরতিতে শাঁখই বাজে না" ।"কেন, শাঁখের আওয়াজে cityর কোন restriction নেই" । শিল্পা ওকোন থেকে মিষ্টি গলায় আওয়াজ দিল ।

"না তা নেই, তবে শাঁখ কেউ বাজাতেই পারে না, সেটাই আফশোষের কথা"। বিদিশা উত্তর দিল,"ঢাকের আওয়াজ, শাঁখের আওয়াজ, কাঁসর, ঘনটা না থাকলে পূজো পূজো মনেই হয় না । যা বলেছিস, চোখ টিপলো বড় করে সাগরিকা ।

সিঞ্চিনি ব্যস্ত ছিল রান্নায় কিন্তু কানে সব কথাই পৌঁছছিল । ফোড়ন দিতে দিতে ফোড়ন কাটলো, "একবার নাকি কৃষ্ণপক্ষেই পূজো করতে হয়েছিল কারণ সেবার electionয়ের জন্য নাকি community hall পাওয়া যায় নি । কেন, গত বছরইতো লক্ষ্মী পূজো নবমী দশমীর পুজো সব একদিনেতেই সারতে হল সম্ভবত ঐ একই কারণেই"।

সব শুনে নমিতা বললো," তা হলে গরমেতে পূজো করলেতো সবদিক থেকেই ভাল হয়। পূজো কমিটির খরচ অনেক কম হবে"। হাসির ফোয়ারা ছুটলো প্রসাদ কাটার টেবিল থেকে কিচেন ছুঁয়ে রান্না চালায় । গুঞ্জন ছড়ালো সমাগত সবার মুখে মুখে।

Hallয়ের এক কোনে খাবারের টেবিলে বসে ছিল জনা কয়েক মধ্য বয়সী মহিলা, relax করছিল। হাসি ঠাট্টা, একই ঘটনা নিয়ে টিটকিরি, টিপপনী মন্তব্য হাসাহাসি । কোথা থেকে দৌড়ে এসে আসল বোমাটা ছুঁড়লো সবার সামনে সুজাতা। বোমা মানে এক বারে নিউক্লিয়ার বোমা, যাকে বলে ব্রহ্মাস্ত্র। সুজাতা উত্তেজিত হয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে গেল বছর কয়েক আগের ঘটনাটা। সরস্বতী পূজোতে সরস্বতীর জায়গায় মা লক্ষ্মীকে বসিয়ে পূজো হচ্ছিল । পূজো প্রায় শেষ তখন বাংলাদেশী এক মাতৃ স্থানীয়া মহিলার চোখে পড়লো ব্যাপারটা । তখন তাড়াতাড়ি কমিটির কয়েকজন স্টোর থেকে সরস্বতীর মুরতি নিয়ে এসে ব্যাপারটা সামাল দিল । পরিশেষে লক্ষ্মী সরস্বতী দু বোনের একসাথে পূজো হল সেবার। সে একটা ঘটনা ।

পারমিতা জুড়ে দিল গলা মিলিয়ে, ”অথচ পূজোর আগে হলে মূর্তির সামনে প্রায় শ’খানেক লোক দাঁড়িয়ে ঘণ্টা খানেক ধরে। অথচ কারো চোখে কিছু ধরা পড়লো না। অদভুত অলৌকিক ব্যাপার”। সব শুনে মিত্রাদি আকাশ থেকে পড়লেন, “তাই নাকি? তার মানে এখানে ঠাকুর, প্রতিমার দিকে কারোর কোন লক্ষ্যই থাকে না । গল্প গুজব, খাওয়া দাওয়া, কাপড় চোপর গয়না দেখানো আর সর্বোপরি পরচর্চা-পরনিন্দাতেই সকলে ব্যস্ত থাকে”।

ড. উদিত চৌধুরী ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকেন । পূজোর সময় মাঝে মাঝে সস্ত্রীক হ্যামিলটনে আসেন ভাইয়ের কাছে । বছর দুই আগে তো সবার মাঝেই বলে দিলেন,”পূজোর কোন sanctity ই থাকে না আপনাদের পূজোয় । পূজো, আরতি, মন্ত্রোচ্চারণ চলাকালীন পরিবেশটা আরও শান্ত সমাহিত হওয়া উচিত । এরকম ভাবে পূজো করার মানে হয় না”। এই কথাটাই আবার মনে করিয়ে দিল ড: চৌধুরীর ভাইয়ের স্ত্রী মন্দিরা খাবারের টেবিলে ।

সেবার দশমীর সকালে পূজা মণ্ডপে গিয়ে দেখি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য । মায়ের চলে যাবার সময় ঘনিয়ে আসছে একদিকে আবার অন্যদিকে গত দু তিন ধরে বা তারও আগে থেকে একটা মোহ, উত্তেজনা, ব্যস্ততা, আনন্দ ও ঘোরের মধ্যে দিনগুলো কেটে গেল। একটা বিচিত্র মিশ্র মনের অবস্থা নিয়ে একটু দেরী করেই মানসীকে সঙ্গে করে মণ্ডপে পৌঁছে দেখি অদ্ভুত ব্যাপার।

মা দুর্গার সামনে ৯-১০ বছরের একটি ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে জোড় হাত করে অঝোর ধারায় কাঁদছে, কেঁদেই চলেছে । ফুলের মত নিষ্পাপ তার মুখ চোখ, ভারি মিষ্টি মুখের গড়ন । আর পাশে তার মাও জোড় হাত করে ঠাকুরের কাছে কেঁদে ভিক্ষা চেয়ে চলেছে । খোঁজ নিয়ে জানলাম অবাঙালী মেয়েটির মুখে কথা ফোটেনি এখনও । তাই মা ও মেয়ে মহামায়ার কাছে তাদের দুঃখ আর্তি জানাতে এসেছে। মায়ের অশেষ করুণায় ছোট মেয়েটির মুখে কথা আসার জন্য প্রার্থনা করছে সকাতরে । সব দেখে জেনে শুনে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। মণ্ডপের একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্যটাই ভাবছিলাম । হঠাৎই কানে

ভেসে এলো উদাত্ত গলায় সেই চিরন্তনী গান মোহন কাকুর কণ্ঠে । মায়ের মুরতির সামনে তিনি গান ধরেছেন হারমোনিয়াম হাতে । উনি ক্লাবের পুরনো সদস্য পাকা চুলে মাঝে মাঝে টাক । গলা ছেড়ে গান করলে এখনও শুনতে হয় বৈকি। মোহন কাকু গান ধরেছেন, পাশে মন্দিরা হাতে বসলেন পরেশদা–

“বোবা বলে কাঁদিস নে মা

বোবা নিজেই ত্রিনয়নী মা

তিনি সবই জানেন, সব বোঝেন

সন্তানদের করেন অপার ক্ষমা”

# ছায়ার পাখী

নন্দিতা ভাটনগর

সবে তখন পূব আকাশে হালকা রঙ ধরেছে; পেছনের বাগানে দুটো ফোঁপরা হয়ে যাওয়া মেপল গাছের ফোকরের মধ্যে জেগে উঠেছে রবিন আর কাঠবেড়ালীর জোড় । শুরু হয়ে গেছে ওদের কিচির মিচির; আর ওরই ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছে কি একটা পাখীর ক্লান্ত করুণ স্বর। অক্টোবর মাস - মেপলের পাতায় পাতায় শুরু হয়ে গেছে রং বদলের পালা। সোনালী আগুন রঙের মাতনে যেন আরম্ভ হয়েছে প্রকৃতির শেষ বেলাকার শেষ গান, শীত আসবার আগে।

ঘুম ভাঙ্গল মিস্টার রোপারের। নিজের নামটা এখন এই ভাবে ই মনে আসে, কারণ আজ আর উইলি বা বিলি বলে সম্বোধন করবার কেউ নেই। কথাটা ভাবলে কেমন একটা শূন্যতা জাগে বুকের মধ্যে। কিন্তু উইলিয়াম সে কথাটা কাউকে বুঝিয়ে উঠতে পারেন না। পাশে তাকিয়ে দেখলেন, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরের বিবাহিতা স্ত্রী লিলিয়ানের ঘুমন্ত মুখখানা। এককালে বে শ সুশ্রী ছিলেন তিনি; আজও তার রেশ মিলিয়ে যায় নি। কাঁচাপাকা কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ ছড়িয়ে রয়েছে বালিশের ওপরে। সস্নেহে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘদিনের জীবনসঙ্গিনীকে বলতে

ইচ্ছে করল, "সুইটহার্ট, তোমাকে কাছে পেয়ে আমি কত যে আনন্দিত' কিন্তু এই সাত সকালে ওসব কথা বলতে গেলে লিলিয়ান কি খুব উপভোগ করবে? বেচারীর শরীরে বাতের ব্যথা; সকালবেলাতেই যা একটু ঘুমিয়ে পড়ে সে।

আর অপেক্ষা করলেন না উইলিয়াম; একটা আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়লেন বিছানা ছেড়ে । হাতমুখ ধুয়ে এককাপ কফি নিয়ে বসলেন এসে পেছনের সান রুমটাতে। তখন ভোরের নরম রোদ্দুরে ভরে গেছে ঘরখানা। লাইব্রেরীর বইগুলো গোছা করে রাখা রয়েছে একটা টেবিলের ওপরে। সেগুলো সব ফেরত দেওয়ার দিন আজ। এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে চোখে পড়ল খবরের কাগজের গোছার পাশে। সেখানে প্রতিদিনের ডাকে আসা চিঠিগুলো রাখবার ছোট ঝুড়িতে রয়েছে একটা সাদা খাম। ডাক তো নিজেই এনেছেন গতকাল; কেন খোলা হয়নি চিঠিখানা! খাপ থেকে চশমাটা বের করে নিয়ে চিঠিখানা দেখলেন উলটে পালটে। ক্যানাডারই চিঠি। ছাপটা নোভাস্কোশিয়ার কোন ছোট জায়গার। ওপরে কিন্তু পত্রদাতার নাম ঠিকানা কিছুই নেই।

নোভাস্কোশিয়া - আটলান্টিকের কোল ঘেঁষে ছোট সবুজ প্রভিন্স ক্যানাডার। ওইখানে একটি ছোট গ্রামে জন্মেছিলেন উইলিয়াম। ছিলেন এক চাষী পরিবারের ষষ্ঠ সন্তান। বাবা, মা আর সাতটি ভাইবোন নিয়ে সচ্ছলতা তেমন না থাকলো আনন্দে কেটেছে তাঁর শৈশব আর কৈশোর। তার পর গত মহাযুদ্ধের সময়ে ক্যানাডার সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন ইউরোপে ১৯৪১ সাল। ওঁর বয়স তখন মাত্র একুশ। যুদ্ধ শেষ হওয়ার অল্প কিছুদিন আগে ছিটকে-আসা শেলের টুকরোয় আহত হয়ে উইলিয়াম ফিরে এসেছিলেন দেশে। এখনও পা একটু টেনে চলেন। ফিরে এসে মোটর মেকানিকসের কোর্স করবার জন্য চলে গিয়েছিলেন হ্যালিফ্যাক্সে; ওই শহরেই আলাপ হয়েছিল লিলিয়ানের সঙ্গে। ওঁর এক সহপাঠিনীর বোন ছিল সে। দু'তিন বছর পরে ওঁদের বিয়ে হয়ে যায়। সেও কতদিন আগেকার কথা।

চিঠিখানা আর একবার উলটে পালটে দেখলেন উইলিয়াম খোলার আগে। না, লেখাটা একেবারেই মনে পড়ছে না। খামটা খুলতেই দুটো মসৃণ সাদা কাগজে গোটা গোটা হরফে লেখা চিঠিখানা বেরিয়ে এল। ওপরে সম্বোধন 'প্রিয় বিলি'। এতদিন পরে এ-নামে কে লিখল। একেবারে শেষের দিকে চলে গেলেন উইলিয়াম, দেখলেন, 'উইথ ফন্ডেস্ট উইশেস, এ্যাফেকশানেটলি, গ্লোরিয়া'। গ্লোরিয়া। সেই মিষ্টি কিশোরী। থাকত ওঁদের পাশের ফার্মেই। উইলিয়াম তখন বিলি নামেই পরিচিত। ওঁরা পড়তেনও একই স্কুলে। সেযুগে ছিল একঘরের মধ্যে স্কুল; গ্লোরিয়া পড়ত দুটো

গ্রেড নীচে। গ্লোরিয়া আর বিলি - সে সময়কার একটি অভিন্ন-হৃদয় জুটি। বার্ন ডান্স, স্কোয়ার ডান্স, বা নতুন বছরের উৎসবে লোকে ওদের নাচ দেখত মুগ্ধ হয়ে। শীতকালে স্লে -রাইডে গ্লোরিয়াই ছিল বিলির 'ডেট'। অনেকগুলো বছর ওরা পরস্পরের সংগী ছিল। দুপক্ষের বাবা-মা আশা করেছিলেন ওদের বিয়ে হবে। তখনকার দিনে তাই তো নিয়ম ছিল। কিন্তু ধূমকেতুর মত এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। আরও বহু তরুণের সঙ্গে বিলি চলে গেল সে কোন সাগর পারের দেশে। যাবার আগের দিন সমুদ্রের একটা খাঁড়ির ধারে পাথরের ওপর বসে বিলির বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে অনেক কেঁদেছিল গ্লোরিয়া। বলেছিল "আমাকে ভুলে যাবে নাতো? আমি তোমাকে চিরদিন মনে রাখব বিলি।" বিলির চোখও শুকনো ছিল না। ছেলেদের কান্না সে যুগে ছিল ভীরুতার লক্ষণ; তবু কেঁদেছিল বিলি।

তার পর ফ্রন্টে গিয়ে প্রথম প্রথম নিয়মিত চিঠি পেত গ্লোরিয়ার; সেটাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। ছোট বোনের চিঠিতে বিলি জেনেছিল গ্লোরিয়া চলে গেছে হ্যালিফ্যাক্সে, কাজ নিয়ে। সেখানে তার আলাপ হয়েছিল ডালহাউসি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের সঙ্গে; সে ছিল কবি। তারই উৎসাহে গ্লোরিয়া ঢুকেছিল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে। রাত্রে কাজ করে খরচ চালাতো নিজের। তারপরের খবরও পেয়েছিল বিলি - গ্লোরিয়া ডিপ্লোমাটা শেষ করে বিয়ে করেছে সেই কবিকে আর চলে গেছে ভ্যাঙ্কুভারে। বিলির তরুণ মনটা কাতর হয়েছিল অবশ্যই। কিন্তু কৈশোরের ওই ছেলেমানুষী প্রেমের পরিণতি এর চেয়ে অন্য কিছু হয়ও না, একথা জানত সে।

তার পর কত যুগ কেটে গেছে; উইলিয়াম জেনেছিলেন যে গ্লো রিয়ার স্বামী বৃটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীর অধ্যাপক। আজ এতদিন পরে সেই গ্লোরিয়া চিঠি লিখেছে তাঁকে । এইবার পড়তে আরম্ভ করলেন সেই চিঠি।

লিখেছে গ্লোরিয়া - অনেক দিন পর গ্রামে এসে শুনলাম ভাইয়ের কাছে তুমি এসেছিলে গ্রীষ্মকালে। তোমাদের পুরনো বার্ন থেকে সেই কাঠের সিন্দুকটা নিয়ে গেছ। মনে পড়ল - ঐটাতে তোমার বাবা রাখতেন যত রাজ্যের পুরনো ক্যাটালগ, ইটনসেরই প্রধানত। আরো থাকত 'সিড অ্যান্ড ফিড' কিম্বা ফার্ম মেশিনারীর ক্যাটালগ। আমরা দুজনে ছোটবেলায় ওগুলো টেনে বার করে ছড়িয়ে দেখতাম, আর ক্রীসমাসে কী চাইব স্যান্টার কাছে তার লিস্ট বানাতাম। তা থেকে কোনদিনই প্রায় কিছু পেতাম না; স্যান্টার ওপর অভিমানও হোত একটু। এখন বুঝি আমাদের নিম্নমধ্যবিত্ত বাবা মায়ের পক্ষে ওসব জিনিস কিনে দেওয়া সম্ভব হোত না। সাধারণত আমরা পেতাম মা বা

মাসি-পিসিদের হাতে বোনা, সেলাই করা জামাকাপড়। আর পেতাম  বাড়িতে তৈরী ফাজ - চকোলেট বা মেপল সিরাপের। ছেলেদের জন্য থাকত পকেটে রাখার ছুরি, হাতে বোনা মোটা মোজা, মিটেনস, স্কার্ফ, এই সব। স্যান্টা যে অন্য জিনিস দেননি, ঠিক সেই সময়টাতে ওকথা মনে পড়ত না। ক্রীসমাস ডে'র দুপুরে হোত ডিনার - যেটার নাম হয়েছে এখন লাঞ্চ। সে ডিনারে থাকত মস্ত টার্কি, কিম্বা চর্বিতে ভরা হাঁস ; কখনও বা মেপল সুগার কিওরড হ্যাম - বাবার নিজের হাতে তৈরী। আর থাকত মায়েদের বানানো নানা ধরণের রুটি, ক্ষেতের সব্জী। আর শেষে থাকত মিনস মীট পাই, হার্ড সসের সঙ্গে। অথবা গরম গরম অ্যাপল পাই, এর ওপরে বাড়িতে তৈরী ভ্যানিলা আইস ক্রীম। হার্ড সসটা কিরকম কিটকিটে ছিল মনে আছে? তবু তো খেতাম। তার পর বেরতাম স্লে-রাইডে। আমরা ছেলে-বুড়ো সবাই খড়ের গাদায় ডুবে বসে কম্বল দিয়ে হাত-পা ঢেকে গাইতাম ক্রীসমাস ক্যারল। সন্ধ্যে হয়ে যেত; দেখতাম বরফের ওপর লম্বা লম্বা ছায়া ফেলেছে ফার গাছগুলো। একটা একটা করে দূরের ফার্মগুলোতে আলো জ্বলে উঠত। ঠিক মনে হোত যেন সত্যিকারের ক্রীসমাস কার্ড।

আমাদের ছেলেমেয়েরা বড় হতে হতে ঐ ছবিটা একেবারে মুছে গেল। আর আমাদের নাতি - নাতনীদের কাছে এ সব তো অবিশ্বাস্য গল্প কথা।  ইটনস তো উঠেই গেল। শুনেছি ঐ সব ক্যাটালগ নাকি এখন কালেক্টর্স আইটেম। এক কথায় ক্রীসমাসের রূপটাই বদলে গেল। টিভিতে লোভ দেখানো সব খেলনা দেখে বাচ্চারা লম্বা লম্বা লিস্ট বানায়, বাবা-মা যথাসাধ্য চেষ্টাও করেন সে সব দেবার। না পেলে ছেলেমেয়েরা হতাশ তো হয়ই, এমন কি তাদের বিরক্তিও ধরে, দেখতে পাই নিজের নাতি-নাতনীদের মধ্যেই। কে কী পাবে সেটাই বড় হয়ে উঠেছে এখন। তবু ক্রীসমাস আসে যায়, এবারও আসছে আর ক'মাস পরেই। তাই মনে হোল তোমাকে চিঠি লিখে একটু স্মৃতিচারণ করি। আশা করি তুমি বা তোমার স্ত্রী কিছু মনে  করবে না পুরোনো বান্ধবীর এই হঠাৎ আবির্ভাবে। আমার স্বামী আমাকে বলেন জন্ম- রোমান্টিক, তাই হয়তো হবে। যে দিনগুলো হারিয়ে গেছে, সেগুলোকে ধরে রাখার চেষ্টা করে কিই বা হবে বলতে পারো? ভ্যাঙ্কুভারের ঠিকানা দিলাম, যদি উত্তর দাও খুব খুশি হব। তোমাকে ও তোমার স্ত্রীকে অনেক প্রীতিপূর্ণ শুভচ্ছা জানিয়ে  - স্নেহ সম্ভাষণান্তে,  গ্লোরিয়া।

উইলিয়াম তখন হতবাক হয়ে গেছেন। গ্লোরিয়া। সেই গ্লোরিয়া। অবশ্যই লিখবেন ওকে। ওঁর নিজেরও তো ইচ্ছে করে সেই দিনগুলোকে মনে করতে। লিলিয়ানের পায়ের শব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন উইলিয়াম। উঠে গিয়ে স্ত্রীর গালে হালকা চুমু দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন  "হ্যালো ডার্লিং,

ভাল করে ঘুমিয়ছ তো সকালবেলাটা? আমি এখনই একপট কফি বানিয়েছি, নিয়ে আসব তোমার জন্য এক কাপ?" লিলিয়ান পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। উইলিয়াম গ্লোরিয়ার চিঠিখানা ওর হাতে তুলে দিয়ে বললেন "এই দেখো, সেই গ্লোরিয়া। এর কথা তো বলেছিলাম তোমাকে। পড়ে দেখো কি লিখেছে।" লিলিয়ান পড়তে আরম্ভ করলেন; উইলিয়াম উঠে গেলেন কফি আনতে।

ফিরে এসে দেখেন তাঁর স্ত্রী চিঠিখানা হাতে নিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছেন। ওঁর সামনে ধোঁয়া-ওঠা কাপটা নামিয়ে দিয়ে বললেন "কী ভাবছ গো?" লিলিয়ান মুখ ফেরালেন, "ভাবছি এতদিন বাদে হঠাৎ এ চিঠি দেওয়ার কী দরকার পড়ল ওর? তুমি ছাড়া ওর কি এসব লেখার লোক কেউ নেই? নাকি স্মৃতিচারণ করার জন্য অন্য কোন বন্ধুও কেউ নেই?" ওঁর স্বরে কেমন যেন একটু অতৃপ্তি বা বিরক্তির ছোঁয়া। উইলিয়াম স্ত্রীর মাথাটা দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে ওঁর মুখখানা তুলে ধরে বললেন "ওল্ড গার্ল, তোমার কি হিংসে হচ্ছে নাকি গো?" লিলিয়ান কিন্তু ঠাট্টাটা গায়ে মাখলেন না; আস্তে স্বামীর হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে বললেন "না, আমি জেলাস নই। কিন্তু হঠাৎ ঐ ভুলে-যাওয়া হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলোকে নতুন করে মনে করবার কিসের এত প্রয়োজন পড়ল ওর? এসবের কি উদ্দেশ্য?" উইলিয়াম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে এলেন ওঁর কাছ থেকে। একথাটা নিজে থেকে না বুঝলে বোঝানো অসম্ভব। ঘড়ির দিকে তাকালেন, প্রায় দশটা বেজেছে। লাইব্রেরীর বই ফেরত দেওয়া দরকার আজই। বললেন স্ত্রীকে "আমি লাইব্রেরীতে ঘুরে আসি চট করে। তোমার যা করার আছে করে নিয়ে তৈরী হয়ে থেকো। তারপর চল একটু হেঁটে আসি। চমৎকার দিনটা আজ। ডাক্তার বলেছেন অতিরিক্ত ঠান্ডা না থাকলে তোমার হাঁটা উচিত।" লিলিয়ান তখনও চিঠিখানা ধরে রয়েছেন হাতে। অন্যমনস্কভাবে বললেন "ওকে ডিয়ার। সি ইউ দেন।"

উইলিয়াম ঢুকলেন বইএর গোছা হাতে, লাইব্রেরীর চেক-ইন কাউন্টারে সেগুলো নামিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজলেন সেই ভারতীয় মেয়েটিকে। গত দশ বছরে ওর সঙ্গে একটা অত্যন্ত সহজ সখ্যতা গড়ে উঠেছে। মেয়েটির নাম সুধন্যা; সেও এসেছে ওঁরই মত একটি মস্ত পরিবার থেকে । উইলিয়াম জেনেছেন ওরও মনটা হুহু করে আজও পরিবারের হারিয়ে-যাওয়া প্রিয়জনদের জন্য। সুধন্যার সংবেদনশীল মনটার পরিচয় পেয়েছেন তিনি; তাই এখানে এলে ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুটো কথা না বললে চলে না। সুধন্যা আবার কয়েকটা পত্র- পত্রিকায় লেখেও ওর নিজের ভাষায়। উইলিয়ামকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে; ক্যানাডার পুরোনো দিনগুলোর কথা জানতে চায়। ওকে মন খুলে সব বলে তিনি নিজেও খুশি হন।

সুধন্যা তখন রেফারেন্স ইনফরমেশনে একজনকে সাহায্য করছিল; লোকটি চলে গেলে উজ্জ্বল মুখখানা তুলে চাইল, "হাই মিস্টার রোপার, কী খবর আপনার?"

উইলিয়াম ওকে ডাকেন 'সুইটি' বলে; ওর অত্যন্ত শক্ত উচ্চারণের নামটা আজও বাগিয়ে উঠতে পারেন নি। বললেন "হ্যালো সুইটি, বইগুলো ফেরত দিতে এসে মনে হোল একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই। একটা প্রশ্ন জেগেছে মনে। তুমি তো লেখ টেখ, হয়তো তুমি আমার মনের কথাটা বুঝবে।"

সুধন্যা মৃদু হেসে বলল "আমাকে কি খুব একজন বোদ্ধা ব্যক্তি বলে মনে হয় আপনার - ঘাবড়ে যাচ্ছি কিন্তু।"

"না, এ জ্ঞানের কথা নয়, নেহাতই অনুভূতির কথা।"

সুধন্যা এবার উৎসুক দৃষ্টি মেলে চাইল ওঁর দিকে।

"জান, গ্লোরিয়ার কাছ থেকে আজ একটা চিঠি এসেছে।"

সুধন্যার চোখের কোনে কৌতুকের হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"ওঃ মিঃ রোপার, সেই গ্লোরিয়া। ইয়োর ওল্ড ফ্লেম।"

একটা ম্লান ছায়া পড়ল উইলিয়ামের মুখের ওপর।

"না, ওল্ড ফ্লেম ঠিক নয় আর, এখন সে শুধু একটি পুরোন বন্ধু যে আমার ওই সোনালী দিনগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। ওই গ্রামটাতে এমন আর কেউ নেই যার সঙ্গে বসে স্মৃতিচারণ করব; সেই সময়কার সব আত্মীয়- বন্ধুরাই পাড়ি জমিয়েছেন ওপারে। আমার ওই সবুজ দিনগুলর সাক্ষী রয়ে গেছে একা গ্লোরিয়াই। একমাত্র ওর সঙ্গেই বসে সেই সময়টাকে আবার ছোঁয়া হয়ত সম্ভব।"

সুধন্যা ওঁর কথার মধ্যেই বলে উঠল "তাতে আর অসুবিধেটা কী? আপনিও তো ওঁকে চিঠি দিতে পারেন। পারেন না?"

"ওইখানেই তো মনে হচ্ছে মুশকিল হবে। আমার স্ত্রী ওর চিঠিখানা সহজভাবে নিতে পারেনি। ও যে ঠিক জেলাস তা নয়, কিন্তু দেখলাম কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল।"

“কিন্তু আপনি তো তাকেই ভালবাসেন।“

“নিশ্চয়ই। ও আমার স্ত্রী, আমার সন্তানদের মা; আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। সেখানে গ্লোরিয়ার কোন স্থান নেই।“

“তবে?” অবাক প্রশ্ন সুধন্যার।

“আমার মনে হয় লিলিয়ানকে সে কথাটা ঠিক বোঝানো যাবে না। অথচ আমার সোনালী দিনগুলোকে স্পর্শ করতে হলে গ্লোরিয়ার চিঠিখানার উত্তর দেওয়া দরকার।“

সুধন্যা তখন ওর চোখ দুটোতে গভীর সমবেদনা নিয়ে চাইল উইলিয়ামের দিকে। তিনি তখনও বলে চলেছেন “কিন্তু আমি জানি তা আর সম্ভব নয়। আমি আমার স্ত্রীকে আঘাত দিতে পারব না।“

সুধন্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উইলিয়াম বাড়ি ফিরে এলেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। চিঠিখানা নিয়ে লিলিয়ানের সঙ্গে আর কোন কথা হোল না। রোজই সেটা একবার করে হাতে তুলে নিয়ে পড়েন উইলিয়াম, কিন্ত উত্তর দেওয়ার উৎসাহ আর খুঁজে পান না। এমনি করে কেটে গেল বেশ কয়েকটা মাস। ক্রীসমাস এলো, এসে চলেও গেল; এসে গেল নতুন বছর। একদিন চিঠিখানা খুব সম্ভবত চলেও গেল গার্বেজে, খবরের কাগজের সঙ্গে। সেটাকে নিয়ে উইলিয়ামের মনের উতলা ভাবটাও থিতিয়ে গেছে ততদিনে।

শীতটা অবশেষে কেটে গেল। এপ্রিলের শেষের দিকে একটা ঝকঝকে সকাল বেলায় উইলিয়াম আবার এসে বসেছিলেন ওঁদের সেই সানরুমে। দেখতে পেলেন সেই রবিন দম্পতি খুঁটে খুঁটে কী খাবারের সন্ধানে ব্যস্ত। ওদের খুব সম্ভবত বাসা বাঁধার দিন এসে গেছে আবা র। কাঠবেড়ালি দুটো এতদিন শীতের ঘুমে কোথায় ডুবে ছিল; তারাও নতুন লোমে ভরা মোটা ল্যাজ উঁচিয়ে ছোটাছুটি করছে মেপলের ডালে ডালে। এবার দেখতে পেলেন দুটি নতুন আগন্তুক এসেছে - টুকটুকে লাল একজোড়া কার্ডিনাল। ভাবলেন বার্ড-ফিডারে খাবার যথেষ্ট আছে কিনা দেখা দরকার। হঠাৎ টেলিফোনের তীব্র ঝঙ্কারে ওঁর চিন্তার খেইটা হারিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি তুলে নিলেন রিসিভারটা - পাছে লিলিয়ানের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

“হ্যালো”, ওদিক থেকে ভেসে এল এক অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠ, “এটা কি মিঃ রোপারের বাড়ি?”

হ্যাঁ, আমিই উইলিয়াম রোপার, আপনি কে কথা বলছেন?”

“ও, বিলি? এত সকালে তোমাকে ঘুম থেকে তুললাম না তো? কিন্তু আমাকে আজ সারাদিন আজ একটা কনফারেন্সে থাকতে হবে; আর কাল ভোরেই চলে যাব। এখন ছাড়া আর সময় হোত না, তাই...।“

উইলিয়ামের বিস্ময়ের ঘোরটা কাটেনি তখনও; লোকটি পরিচয় দিলেন নিজের, “আমার নাম স্টুয়ার্ট জনস্টন, তোমার বাল্য বান্ধবী গ্লোরিয়া ছিল আমার স্ত্রী।“ এতক্ষণে উইলিয়াম ওই ‘বিলি’ সম্বোধনের কারণটা খুঁজে পেলেন। গলাটা পরিস্কার করে নিয়ে বললেন “হ্যালো মিঃ জনস্টন...”

স্টুয়ার্ট বাধা দিয়ে বললেন “না বিলি, শুধু স্টুয়ার্টই যথেষ্ট । আচ্ছা, দরকারী কথাটা আগে বলে নিই। আমার মীটিং শুরু হবে ঠিক আটটায়।“

উইলিয়াম বাধা দিয়ে বললেন “গ্লোরিয়ার কী খবর? সেও কি এসেছে তোমার সঙ্গে?”

স্টুয়ার্টের গলায় হঠাৎ কেমন বিষণ্নতার সুর বাজল, “না বিলি, গ্লোরিয়া তো আর নেই। ওর ক্যানসার হয়েছিল; ধরা পড়েছিল গত গ্রীষ্মে; করারও বিশেষ কিছু ছিল না। ক্রীসমাসের আগেই সব শেষ হয়ে গেল।“

উইলিয়াম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্টুয়ার্ট বলে চলেছেন “ও খুব চেয়েছিল ওদের ছোটবেলার সেই বাড়ি, সেই ফার্মটা একবার দেখতে। আমি ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম নোভাস্কোশিয়ার সেই ছোট্ট গ্রামটাতে। ওখান থেকেই তোমাকে ও একটা চিঠি লিখেছিল। তোমাদের ছোটবেলাটাকে আর একবার ছুঁতে চেয়েছিল। রোজ আশায় থাকত, হয়তো উত্তর আসবে তোমার; কিন্তু এল না। তুমি কি চিঠিখানা পেয়েছিলে, বিলি?”

উইলিয়ামের চোখদুটো অশ্রুর বন্যায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল; কোনমতে সামলে নিয়ে বললেন “হ্যাঁ, পেয়েছিলাম, কিন্তু উত্তর দেওয়া হয়নি। আমারই দোষ, আমারই ভুল। কী করে যে ক্ষমা করব নিজেকে, জানি না।“

স্টুয়ার্ট সান্ত্বনার স্বরে বললেন “দুঃখ কোরো না, মাই ফ্রেন্ড। অনেক সময় চাইলেও সব কিছু করা সম্ভব হয় না। যাই হোক, গ্লোরিয়াকে কথা দিয়েছিলাম তোমাকে ওর চলে যাবার কথা জানিয়ে দেব। ইতিমধ্যে এখানে আসা ঠিক হোল, ভাবলাম সম্ভব হলে দেখা করেই বলব কথাটা। কিন্ত সেটা সম্ভব হোল না বলেই ফোন করতে বাধ্য হলাম। যদি কখনও বৃটিশ কলাম্বিয়াতে যা ও, আমার কাছে উঠো। এখন একেবারে একা। গ্লোরিয়া ভেবেছিল চিঠিটার উত্তর পেলে তোমাদের

একবার যেতে বলবে ও থাকতে থাকতেই। সে আর হোল না। এবার চলি তবে আমি। অল দি বেস্ট টু ইউ বোথ।“

ফোনটা ছেড়ে দিলেন স্টুয়ার্ট। উইলিয়াম ততক্ষণে বসে পড়েছেন সামনের চেয়ারটাতে। এতদিন পরে লিলিয়ানের ওপর একটা সূক্ষ্ম অভিমানে মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল, আর নিজেকেও যেন ক্ষমা করতে পারছিলেন না উইলিয়াম। বারবার মনে হতে লাগল তাঁর, এইবার সেই অমূল্য স্মৃতিগুলো চিরদিনের মতই মিলিয়ে গেল, উড়ে গেল তারা ছায়ার পাখী হয়ে কোন দিগন্তে, যেখান থেকে কোনও কিছু আর ফিরে আসে না কোনও দিন।

## একটি অনুরোধ

**সুপর্ণা মজুমদার**

তোমার জগতে চাঁদ তারা প্রেম, আমার জগতে সুনামী -

তাইতো তোমার বড় নাম ডাক - আমি কবি এক অনামী ।

তোমার মুখেতে মধু মাখা কথা, সিন্দুক ভরা টাকা,

আমার শুধুই বুক জোড়া ব্যাথা, এবং পকেট ফাঁকা ।

তোমার গাড়িটা যেন ডানা মেলে ভেসে চলে অবহেলে,

পিছনের সিটে তুমি বসে থাকো উদাসীন চোখ মেলে ।

হাড় জিরজিরে রোগা এক শিশু, গাড়ি দেখে ছুটে আসে -

হাতটি বাড়িয়ে কাঁচের ওধারে সকরুণ হাসি হাসে ।

তেল চিটচিটে ছেঁড়াখোঁড়া জামা, সারা গায়ে ধুলোবালি -

ঘৃণায় ওদিকে চোখটি ফেরাও, মুখে আসে কিছু গালি ।

কাদের খেয়ালে এরা জন্মায় কেনই বা বেঁচে থাকে -

মগজেতে ঘোরে এসব প্রশ্ন নিত্য কাজের ফাঁকে ।

কর্তারা বলে “গরীবি হটাও” গরীব তো কই হটেনা

পথে ঘাটে এই দুঃস্বপ্ন গুলো মেটাতে চাইলে মেটেনা ।

(তবে) কিছু মরে স্রেফ অনাহারে আর কিছু মরে রোগে জ্বরে -

রাস্তায় শুয়ে কিছু লোক মরে বড় গাড়ি চাপা পড়ে ।

এরাতো বোঝেনা তোমার কাব্য, এরাতো বোঝেনা ধর্ম -

এরা শুধু বোঝে ভাঙা কাঁসিটাতে গরম ভাতের মর্ম ।

ওরা শ্রেণী এক সর্বহারা, ‘দিন আনি দিন খাই’

রয়েছে ছড়িয়ে যত্র তত্র, পায়না কাব্যে ঠাঁই ।

ওগো নামী কবি, লেখোনা কাব্য চোখের জলের ব্যথায় -

বাঙলাতে আনো নতুন জোয়ার ওদের জীবন গাথায় ।

# খোশ-গল্প

আদিত্য চক্রবর্তী

খোশ-গল্প  কথাটা শুনেই কেমন যেন মনে হল কিছু একটা খুশীর ব্যাপারই হয়তো হবে। সুতরাং খুশীর যখন একটা কথা পাওয়া গেছে - তাই দিয়েই শুরু করা যাক।

কিন্তু মনে মনে বেশ কিছু বার খোশ-গল্প উচ্চারণ করতে করতে মনে হল তাহলে খোস-পাঁচড়া ও কি খুশীর ব্যাপার!

জানি না - বিহারে মানুষ বলেই হয়তো অথবা সমধ্বনি শুনতে লাগলো বলে, খোশ -গল্প আর খোস- পাঁচড়া দুটোই আনন্দ বর্ধক কোন ব্যাপার বলে মনে হল পয়লা চোটে। কিন্তু তারপরেই ভাগ্যিস খেয়াল হল -- আরে ‘শ’ আর ‘স’ র একটা তফাৎ চোখে পড়ল। ভাগ্যিস, নয়তো যত রথী-মহারথী, বঙ্গভাষার রাখহরি তারা কি আর আমাকে আস্ত রাখত? এই ছড়া দিয়ে আমার বাংলা লেখা চিরদিনের মতন ban করে দিত!

“বিহারী ভূত, খটিয়া মে সুত

টিক্কী মে আগ লগা, ধড়ফড়াকে উঠ!”

ছোটবেলায় এটা খেলতে, ওটা খেলতে, সিঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে প্রায়ই আমার পায়ের মাঝখানে, হাঁটুর কাছে এই একটু কেটে যেত, ছড়ে যেত। এটা প্রায়ই হত এবং যতবার হত ততবারই আমার পাঁচড়া  অর্থাৎ খোস-পাঁচড়া হত। বেশ টনটনে ব্যথা! বলতে কি আমার আনন্দই হত - হাত বুলাত আরাম লাগত - আর অনেক সময় বাবাই বলতেন এই অবস্থায় আর স্কুলে যেতে হবেনা! আমার পক্ষে এটা তো বেশ খুশীরই ব্যাপার - তাই না?

যাকগে --  অন্যত্র যাওয়া যাক। কোথায় যেন শুনেছিলাম সেই মাতালের কথা। মাঝরাত্তিরে মাতাল হয়ে বাড়ী ফিরছে। রাস্তায় আলো টিমটিম করে জ্বলছে। মাতালও নিজের তালে গুনগুন

করতে করতে বাড়ীর দিকে চলেছে। হঠাৎ পথের মাখখানে দেখে একটা কালো গোল মতন কি একটা পড়ে আছে। মাতাল বাঁয়ে ঘাড় ঝোঁকালো, ঘাড় ডাঁয়ে বাঁকালো, চোখ টান টান করে দেখার চেষ্টা করল - কি রে বাবা এটা - বলে মনে মনে খুব চিন্তা করল। ভাবার চেষ্টা করল কি হতে পারে - কিন্তু মাতাল আর কত ভাববে! সেই কালো তালকে মাতাল জিজ্ঞেস করল - তুই কে রে বাবা - কোথা থেকে এলি এই পথের মাঝে। কোন উত্তর পেল না মাতাল। ধুত্তেরি বলে টলতে টলতে ঝুঁকে মাঝের আঙ্গুলটা দিয়ে একটুখানি সেই পদার্থটা তুলে মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিয়ে বলে উঠল - ভাগ্যিস আমি মাতাল হয়ে যাইনি একেবারে। বুঝতে পেরেছি তুই বেটা একটা গোবরের তাল। ভাগ্যিস আমি ওটাতে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিইনি, মাতাল হয়ে গেলে নির্ঘাৎ মুখে না দিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়েই দিতাম। ভাগ্যিস!!

আরেক মাতালের গল্প মনে পড়ে গেল। এক পানশালায় এই মদ্যপ রোজ সন্ধ্যাতে যায় - খুবই উৎফুল্ল মেজাজ - গান করে, মজার মজার গল্প বলে সবাইকে মাতিয়ে রাখে। তাই এই মাতালের প্রচুর বন্ধু এখানে - এমনকি যে বারম্যান মদ ঢেলে দেয় সেও আমাদের এই মাতালের ইয়ারদোস্ত্। একদিন এই বারম্যান লক্ষ্য করল এই সদাপ্রফুল্ল মাতালবাবু খুবই দুঃখিত মনে ঘাড় নীচু করে বসে রয়েছে। কোন ঠাট্টা-তামাশা করছে না - না কোন গান। বারম্যান জিজ্ঞেস করল - বন্ধু - তোমার মনে আজ কোন আনন্দ নেই - ব্যাপারটা কি - কি হয়েছে? আমাদের মাতাল বলল - কি করব বন্ধু - আমার বউ বলেছিল মদ না ছাড়লে আমার সঙ্গে তিরিশ দিন কোন কথা বলবে না। আমার মনে তাই খুবই দুঃখ, শান্তি নেই - কারণ আজই সেই তিরিশ দিনের শেষ দিন!

হৈহৈ করতে করতে একেবারে দেখছি মাতলামিতেই চলে গেছি। ভাবলাম এবার মাতলামি থেকে একটু বেরিয়ে একেবারে আঁতলামিতেই চলে যাই, জ্ঞানগম্ভীর কথা বলা মাঝে মাঝে বোধহয় মস্তিষ্কের জন্য খুব খারাপ হবে না।

যাই হোক, বাঙ্গালীর সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ - মার মার কাট কাট - মানে মুর্শীদাবাদ। রক্ত জল করা সেই যুদ্ধ - না কি জল করা রক্ত। কিছু একটা হবে নিশ্চয়ই। বাঙ্গালীর যুদ্ধ - আমাদের যুদ্ধ - বাবাঃ সোজা কথা!

এই সব চিন্তা করতে করতে দুর্গাচরণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক ঘনশ্যাম তালুকদার মশাই টেস্ট পরীক্ষার খাতা খুললেন। প্রশ্নটি কি না - পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা জানো লেখ।

রাত্রিবেলা তখন। গিন্নীর হাতের অতি উত্তম স্বাদের রন্ধনশিল্প উপভোগ করে একটি মিঠা পান চিবুতে চিবুতে বিছানায় আধশোয়া হয়ে টেস্ট পরীক্ষার খাতাগুলো টেনে নিলেন কোলের কাছে। সেই বান্ডিল থেকে প্রথম খাতাটা খুললেন। দিলখুশ খানা খেয়ে বেশ ঘুম ঘুম পাচ্ছে - প্রায় এলিয়েই যাচ্ছেন বিছানায়। তবুও কি মনে করে খাতাতে চোখ বুলালেন আলতো করে। লাফিয়ে উঠলেন প্রায় - আরেব্বাস - প্রেসার বেড়ে গেল নাকি? হঠাৎ?

আবার প্রথম কয়েকটা লাইনে চোখ রাখলেন। না, মনে হচ্ছে এই বলিষ্ঠ লিখন তো গদাই এর। পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে তার পড়াশুনার তারিফ না করে পারলেন না। ঘনশ্যামবাবুর ক্লা সে পড়ান তাহলে সার্থক হয়েছে। তালুকদার মশাই পড়লেন --

তাপ্পর তো পেচ্চন্ড যুদ্ধ লেগে গেল। পেচুর লোক 'মার বেটাদের' বলতে বলতে তলবার, ঢাল, তীর, ধনুক নিয়ে হারেরেরে করে তেড়ে গিয়ে মারামারি করতে লাগল। একেবারে রাম -রাবণের যুদ্ধের মত ব্যাপক মারপিট। কি অক্ত, কি অক্ত!

তালুকদার মশাই তো এবার অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলে বসলেন। এরকম সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছে - আর তো ঘুমান যায়না। এর শেষ কোথায় দেখতে হচ্ছে। কিন্তু কে যে কার সংগে লড়ছে এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা।

যে যাকে সামনে পাচ্ছে ঠ্যাঙ্গাচ্ছে, ক্যালাচ্ছে, উফ্, সে কি মারামারি - যাকে বলে মারমার কাটকাট ব্যাপার। এই সব ওইতিহাসিক ঘটনা জর্জ বেকার নিকেছেন ওইতিহাসের বইতে।

ঘনশ্যামবাবু যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত। সাধু সাধু - গদাই এর শিক্ষা সার্থক। দশে কি হাফ নম্বর দেবেন?

কিন্তু গদাই এর রচনার শেষ লাইন পড়ার পর ওনার আর কিছু মনে নেই। উনি এখন আরোও কিছুদিন থাকবেন কাঁকের ঠিকানাতে।

শেষ লাইনে লেখা, "প্রবল যুদ্ধ করে পলাশী ভীষণ ক্লান্ত হয়ে অতঃপর বাড়ী ফিরে গেলেন"!!!

এই বলিষ্ঠ লেখনীর দৌলতে মনে পড়ে গেল আরেকটি ঘটনা। পাড়ার ছেলেরা সবাই সরস্বতী পূজার চাঁদা নিতে বেরিয়েছে। পাড়ার মস্তান সব - এই বড় বড় হাতের মাশুল। এসে দাঁড়াল দরজায় 'এই যে চন্দা দিন চন্দা - বেন্দনাদেবী প্রেতিমের পূজা হবে। পাড়ার ছেলেদের নিখাপড়া

হবে তাহলে' বলে চাঁদার খাতাটা এগিয়ে দিল আমার দিকে। খাতার উপরে লেখা "বানি বেন্দনাতে গোয়ালপাড়া সেরসেতী ক্লাব"। আমার ছানাবড়া চোখ দেখে ওরা কিছু বুঝল। বলল - জানি জানি। আমরা পাড়াতে কনটেস্ট করেছিলাম। এই "সেরসেতী" বানানটা দেখতে সবথেকে সুন্দর তাই সেটা জয়ী হয়েছে।

# কিরণশশী

## মদনমোহন ঘোষ

সময়টা সাতের দশকের মাঝামাঝি। শীতের ভোরে সবাই কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। মোরগ দুটো পাল্লা দিয়ে ডাকতে শুরু করেছে। এমন সময় সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। "দিদু এসেছে, দিদু এসেছে", বাদল লাফিয়ে ওঠে। এই মুহূর্তটার জন্যই তো সে অপেক্ষা করছিল। ঝটপট গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে পায়ে চটি গলিয়ে দরজার দিকে ছুটল সে। দরজা খুলতেই দমকা হাওয়ায় ঘরটাকে হিমেল করে তুলল।

বাদলের দিদুর ডাকনাম কিন্নি। বয়স সত্তরের কোঠায়। কিন্নি বাল্য বিধবা। শ্বশুর বাড়িতে খুব বেশী দিন থাকেননি। বিয়ের কয়েক মাস পরেই স্বামী মারা যান। সেই থেকেই বৌদি, দুই ভাইপো ও তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে যৌথ পরিবারে বহাল তবিয়তে আছেন। সারাদিন কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত। চাকর বাকর নিয়ে বাইশ জনের সংসারে কাজের কি আর শেষ আছে। রাতে ঘুমোতে যান দোকান ঘরে ভাইপোদের ব্যবসায়ের হাজার হাজার টাকার সামগ্রী চোরের উপদ্রব থেকে সুরক্ষিত রাখতে। দরজা খুলতেই কিন্নি বাদলকে আদর করে, "ও আমার জ্যোষ্ঠি মাসের মিষ্টি মতন বাদল রে!" বাদল দৌড়ে চলে যায় গোয়াল ঘরে হাঁস মুরগীর ডোবের দিকে। কিন্নি এক ঘটি জল নিয়ে প্রথমে সদর দরজায় তারপর খিড়কির দরজায় ছেটায়। সকাল বেলায় এই জলের ছোঁয়ায়

পরিবেশের দূষিত বাতাস নির্মল হয়, সামাজিক পাপ, কলঙ্ক ও অবক্ষয় মুছে যায়। সংসারে করুণাময় ঈশ্বরের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।

পূর্বাকাশের লালচে রঙের চাদর গোয়ালঘরের পশ্চিমের দেওয়ালটাকে ঢেকে ফেলেছে। বাদলের পায়ের শব্দে হাঁস মুরগীগুলো গলা ফাটিয়ে ডাকতে থাকে। অন্য কেউ আসার আগে পুকুরের শানের উপরে ঘুমিয়ে থাকা শামুক গুলোকে ওরা খেতে চায় যে। কাল বিকেলে নুফুল-বলাইরা বাঁক সাজিয়ে সার বেধে বেঁধে বাদলদের খামারে ধান বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ঝরে পড়া নতুন ধানে ওরা করতে চায় নবান্ন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই প্রতিযোগিতা দেখতে বাদলের ভালো লাগে। বাদল ছোট্ট করে ডোবের দরজা খোলে। একের পর এক, হাঁস মুরগীগুলো বাদলের হাত ছুঁয়ে ছুটে বেরুতে থাকে। এক,দুই, তিন...বাদল মিলিয়ে দেখে সবাই আছে কিনা। রাতে খাটাসের উপদ্রব আছে কিনা। এইতো কদিন আগে খাটাস এসে সবচেয়ে বড় মুরগীটাকে নিয়ে গেল। সবার শেষে কাজলী বেরুল। বয়স হয়েছে হাঁসটার, বেশি নড়াচড়া করতে পারে না। অন্যকে টেক্কা দিয়ে খাবার কেড়ে খেতে পারে না।

অন্যেরা দৃষ্টির আড়াল হতেই বাদল পকেট থেকে এক মুঠো চাল বের করে কাজলীকে দেয়। কাজলী খেতে থাকে। উঠোনে ঝাঁট দিতে দিতে কিন্নি চেঁচিয়ে ওঠে, "হ্যাঁ, আজ আবার তুই ওই বুড়ো হাঁসটাকে চাল দিয়েছিস! একবছর হল ডিম পাড়ে না, বুড়ি হয়েছে আর খাইয়ে কি হবে।" কিন্নি এগিয়ে আসে, কাজলীর খাওয়া প্রায় শেষ। বাদল ওকে ঘিরে রাখে। কিছুক্ষণ পর কাজলী এক-পা দু-পা করে এগুতে থাকে, বাদল হাত নেড়ে ওকে বিদায় জানায়। দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না কাজলী দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। বাদল মনে মনে প্রার্থনা করে ও যেন আবার সন্ধ্যায় ফিরে আসে।

বাদল দৌড়ে চলে আসে হাঁস মুরগীর ডোবে। আজও পাঁচটা ডিম পেল সে। ডিমগুলো নিয়ে খিড়কির পুকুরে ধোওয়ার পরেই বাদল শান্ত হয়। উঠোন ঝাঁট শেষে একটা ঘুটের ছাই হাতে নিয়ে অবশিষ্ট দশ-বারোটা দাঁতের যত্নে কিন্নি পুকুরের দিকে এগোয়। ভগ্নপ্রায় শানের পাশে কাজলীকে দেখে কিন্নির বুকটা কেঁপে ওঠে। কাজলী কেমন ঝিমাচ্ছে, জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। কিন্নি বুঝতে পারে ওর দিন শেষ হয়ে এসেছে। অন্য হাঁসেরা তখন শালুক পাতাগুলোকে ঘিরে ডুব মারছে আবার ভেসে উঠছে। কখনও বা মুখে একটা ছোট্ট মাছ কখনও বা একটা গেড়ি শামুক। কিন্নি কাজলীকে ধরতে যায়। কাজলী সরে যাওয়ার চেষ্টা করে, পারে না। এখানে এইভাবে পড়ে থাকলে শেয়াল-খাটাশে নিয়ে যাবে। কিন্নি কাজলীর মধ্যে কোথায় যেন নিযেকে খুঁজে পায়। কাজলীকে নিয়ে ঘরে ফেরে সে।

# লুখ্যি

বেণু নন্দী

তোমরা যা ভাবতে পারো ভাবো - আমি কিন্তু ওদের লুখ্যিই বলব। বেশ কয়েকটা কাঠবেড়ালি আমার বাড়ির চতুর্দ্দিকে - আমার বাড়ি শুধু কেন বলব - আশপাশের বাড়িতেও বেশ ঘুরে বেড়ায় তুড়ুক্ তুড়ুক্ করে। নির্ভয়ে রাস্তাও পার হয়। কিন্তু ওদের স্বভাব ভারি দুষ্টু।

আমাদের দেশে দক্ষিণে রামচন্দ্রকে পার করতে ওরা কত সাহায্য করেছিল - যার জন্য রামচন্দ্র ওদের পিঠে আঙ্গুল ছুঁইয়ে আশীর্ব্বাদ করায় ওদের পিঠে বরাবরের জন্যে তিন আঙ্গুলের দাগ রয়ে যায়। কিন্তু এখানকার কাঠবেড়ালির পিঠে সে সব নেই।

বলছিলাম না - এখানকার লুখ্যীরা ভারী দুষ্টু। ক্ষতি করতে ওস্তাদ। দুটো তিনটে আছে - বেশ নিজেদের মধ্যে খেলা করে। একজন অন্যজনকে তাড়া করলে বেশ লাফিয়ে লাফিয়ে গাছের ডালে চলে যায়।

সবকটা কিন্তু একরকমের দেখতে নয়। কারুর ল্যাজটা হাল্কা ছাই রঙের আর শরীরটা গাঢ় ইস্পাত রঙের। কেউ আবার সম্পূর্ণ কালো।

আমার জন্মদিনে স্টেফানিয়া আমাকে একটা ছোট্ট লাল টুকটুকে রঙের গোলাপ গাছ দেয়। আমি সেটা আমার ডেকে অন্যান্য ফুলগাছ ও বাহারে গাছের সঙ্গে রেখে দিই। সুন্দর টুকটুকে লালফুল - ও মা একদিন দেখি একটা লুখ্যি একটা লাল গোলাপ নিয়ে ডেকের রেলিঙের ওপর বসে খুদে খুদে হাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে।

তাই শুধু নয় - ডেকের টবেতে আমি বেশ ভাল মাটিতে সার দিয়ে সেখানেই পুঁই গাছের বীচি পুঁতি -ওমা দেখি সেই টবের মাটি খুঁড়ে ওলোট পালোট করে দিয়েছে - পুঁই বীচির কোন আর পাত্তাই নেই। আবার প্রতিবেশী ক্যাথিদের বাড়ির রেলিঙের ধারে ওদের বেশ সুন্দর হ লদে রঙের

মরশুমী ফুল হয় -লুখ্যিদের সেদিকেও আবার নজর। একদিন দেখি একটা করে হলদে ফুল তু লছে আর মনের আনন্দে ছিঁড়ছে। সে ফুল খাওয়া দাওয়ার কোন বালাই -ই নেই।

আমি ওরা যখন এভাবে ফুল তুলে নষ্ট করছে দেখে ওদের দিকে কট্ কট্ করে তাকাই ওরাও ঠিক তেমনি সেই ভাবে আমার দিকে ফিরে তাকায়। এতটু কু ভয় নেই।

কতগুলো শশা গাছ পুঁতেছিলাম - বেশ শশা ধরেছে তাতে - ওমা দেখি সেগুলো ডেকের রেলিঙের ওপর এনে কামড়াচ্ছে আর ফেলে দিচ্ছে। দেখ তো কি স্বভাব! সামনে সিঁড়ির পাশে টবে গাঁদা গাছ লাগিয়েছিলাম। ছোট ছোট ফুল হতে না হতেই লুখ্যিগুলো ছিঁড়ে ফেলে শেষ করে দিল।

বলছিলাম না - নির্বিঘ্নে ওরা রাস্তার এপার থেকে ওপারে চলে যায়। গাড়ি ঘোড়া চাপা পড়ার কোন ভয়ই নেই। তারপর মাথার ওপর দিয়ে যেসব মোটা মোটা ইলেকট্রিকের তার চলে গেছে সেখানে দিন-রাত খেলা করছে। অবুঝ প্রাণী তো! ইলেকট্রিকের তারে যে শক্ লাগতে পারে সে বুদ্ধি নেই!

আচ্ছা তোমরাই বলো - ওদের নিয়ে কি করি?

এদিকে একা আমি আনমনে যখন বাড়িতে থাকি - তখন ওদের ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে এ ডাল থেকে ও ডালে নাচানাচি ও তো বেশ মন্দ লাগেনা!

# Recipes

Sharmistha Chatterjee

They are extremely unhealthy but very yummy.

## 1.Gandharaj chicken

Ingredients
500 gms boneless chicken cubes
Kaffir lime leaves 2-3
Lime juice 1
Garlic powder 3 tbsp
Salt & pepper to taste
Flour 2 tbsp
Rice flour 1 tbsp
Cilantro blended 3 tbsp
Oil for deep frying

Method
Pat dry chicken cubes with paper towel.
Marinade chicken with above ingredients for 1 hour
Heat oil and deep fry the chicken cubes.
Incase you want to bake, add 4 tbsp oil with the marinade and grill first on low and then on high.

## 2. Prawn pakoda

Ingredients
Prawn 500 gms (no shell)
Ginger garlic minced 2 tsp
Salt and pepper to taste
Green onion chopped 2 tbsp
Sweet Thai chill sauce 2 tbsp
Corn flour 3 tbsp
Egg 1
Oil for deep frying

Method
Mix all the above ingredients.
Form small prawn balls with 2-3 together depending on the size and deep fry.

# Rules of the Game

Oishee Ghosh

As humans, we enjoy playing games. Whether they be Flappy Bird or the Olympics, games have always been at the forefront of our culture. Each game has a clearly defined set of rules. Rules, that with time and persistence can be mastered. Patterns and loopholes can all be found, simply to help the humans learn the rules of the game. And so, I beg to ask, in the game of life, what are the rules of the game? How exactly can one ‘win’ the game? To me, it seems that humans have grappled with this idea for long periods of time, without truly saying it. We are constantly inundated with the lives of many people, who in their own ways, are part of the game. Humans play the game however they want, exposing the infinite factors that define this game. As such, one may have to face seemingly simple questions - honesty for morality or lie for cheated success? I could go on and on.

The point of this sentiment, dear reader, is to portray how differently one may approach the rules of the game, whatever they may be - as for each individual, they are different. However, what is incredibly intriguing in this stance is the sheer variation different individuals may have in their fundamental values. Values, which in fact shape the very basis of the rules of the game. And as such, for those who want success, which ladder will get them there? Will a snake bite their back should they take the wrong step?

We as humans are so capable of creating games, but are they really used to exercise the mind or distract the mind from the game of life? All too often we consider ourselves, our steps and missteps, wins and losses, all to see if we are still winning the game.

But what is happening here is a simple lack of understanding, dear reader. All too often, we measure our success with how far we stand in the game. But in my short fifteen years, I have learned that the game is not so much a game. It is instead a challenge we give to ourselves, as humans we want to *be* better. *We* create our own game. Therefore, I challenge you, in your game, to seek another challenge, one that you have not tried before. One that does not balance success as simply a measure of winning the game. If the game of life actually is real, and we govern the rules, then why aren’t we the winners?

# SUNYA AND PURNATA (Void vis-vis Fullness)

Dr. Sourendra K. Banerjee

People from ancient times have been wondering about the origin of existence (Sat). Rig Vedic Nasadiya hymn (10.129) raises the paradox of 'Sat' and 'Asat' (non-existence) by declaring "darkness in the beginning was hidden by darkness" "then space was not there, nor space-lessness "(Verse 3 and 1). Manusmriti (1.5) suggests that elements of the Universe came out of pitch darkness of the un-manifested Void. Chhandogya Upanishad (8.3.1) says the colorful diversity arises from Shyam (literally dark). Brihadaranyak Upanishad (1.2/1,2,3,) echoes there was nothing in the beginning, death as hunger covered this emptiness. These statements, qualified later, raise the issue of whether non-existence is the substratum of existence. It conforms with the popular belief that a building is constructed in the space where there was not any.

Void (sunya) is usually termed as Vacuum, which strictly speaking, is a 'free space' devoid of either matter particles (electrons, quarks, etc) or force particles (like photons, bosons etc.). This does not exist. A Vacuum is now defined as a field (in space-time) where a force can communicate. In Vacuum Technology, any space less than atmospheric pressure is called vacuum. The highest Vacuum achieved on earth is $10^{-8}$ N. per sq. meter (N or Newton is a force that accelerates a mass of 1kg by 1 m per $sec^2$.) Actually more Vacuous Spaces occur in the Outer Spaces of the Universe where temperature is 2 or 3 degrees above absolute zero (-273 degrees C). The Universe is whatever we are connected to (planets, galaxies, seemingly empty space in the cosmos) by light or any radiation. It has (i) Visible Matter, (ii) Matter too dim to be seen (together about 6 to 7 %), (iii) Weakly interacting massive particles (wimp, about 30%) and the rest by (iv) Dark Matter. Matter keeps the galaxies gravitationally bound and counters the expansion of the Universe. Hawking explains that the total energy of the universe is zero. Alan Guth (1979) said that the universe is the ultimate 'free lunch' as opposed to the popular saying 'there is no such thing as free lunch'. But what does keep the universe expanding by about 5 to 10 % in one billion years?

Vacuum is, as said earlier, a field where energy, momentum etc. may be represented by discrete (countable) packets (Quanta) which may have property of matter (e.g. position with three co-ordinates) or a wave (which has infinite number of paths from one point to the other). Feyman formulated a Sum of Paths method using Fourier Analysis (involving imaginary tines) which, to its credit, gives quite accurate results.

The seemingly empty vacuum really has within it a tremendous activity of creations of matter particles and antimatter particles, which annihilate each other. Heisenberg's principle of uncertainty (1927) in a Vacuous field says that measurements of energy E and time t will have errors such that their product exceeds $6.63X10^{-34}$ JS (Joule-Sec) This implies that energy and therefore, mass particle can be created and repaid by producing an antiparticle for a very 'little' amount of time. Dirac was the first person to predict in 1928 that a positron (an antiparticle of electron) is there before it was discovered in 1932. Every particle has an antiparticle. An antiparticle is virtual and cannot be detected but has it's measurable

effects. Thus Vacuum is really a plenum (Bhumaa) for productions of particles and antiparticles. In the field near a black hole (or a wormhole) some particles escape from the abyss and create matters.

Einstein's general theory of relativity (1915) is the basis for cosmological theories. He had originally introduced an anti-gravitational constant Omega in his equation. Later he withdrew it, as he believed in a Static Universe. It resurfaced in 1970's. This is interpreted as energy density of Vacuum (Brian Green p. 414) which causes the Universe to expand. Different
Wormholes have different values of Omega. Russian physicist Friedman has always believed in the mathematics of Einstein's Relativity Theory, including Omega. He had predicted (1922) about the expanding Universe which was confirmed later by Hubble (1929).

Friedman started the Big bang theory of cosmology, which states that the Universe originated with a huge explosion of the initial Singularity (an extremely small and hot region having infinite curvature and density). This theory was improvised many times by physicists like Alan Guth's (1979) inflationary model and others. The inflationary theory says that during times $10^{-35}$ to $10^{-33}$ seconds after the big bang, the universe grew by $10^{30}$ times. The problem with this singularity is that, it is obscured by a wall of ignorance of Plank Size of $10^{-33}$ cm. All laws of physics (Relativity, Quantum, String) fail before time $10^{-43}$ Sec. (Plank's time). Around 1983 Linde's (and others') Chaotic model was introduced. They suggested the Universe is a 'zero spin field'. It is agreed that from the Universe's age of 100 sec. it's history is 'accurately' known. Penrose and Hawking contributed to these theories during 1965 – 1970 but from early eighties Hawking started Feymanian ideas of sum of histories. He believes that even without the 'Singularity' and its associated ideas of 'infinities' a cosmological theory can be expressed with no boundary conditions. He avoids the problems of singularity, but that does not mean that the initial Singularity did not happen. Einstein's ideas are further supported by recent confirmation of gravitational waves predicted by Einstein in 1951, as well as the detection at CERN of 'god particles' or something akin to mass-giving entities (both in 2014).

The initial Singularity is comparable to the idea of 'Bindu' in Hindu metaphysics, a transcendent entity where the potency (Shakti) of 'space-time' (kalaa, kaal) develops. Shakti is also designated as 'Brahma Shakti' or 'Shabda Brahma' or 'Om/Aumkar'. This is interpreted as Source of Vibrations (may be with wavelength less than 200 nanometer, which in spectroscopy is called Vacuum Ultraviolet). This potency manifests as fire storm of 'kaal' (kaalagni) and gives rise to Prakriti (some entity like Vacuous space) where 'gunas' (cf. fundamental particles) thrive. Here all the forces (electro-magnetic, weak, strong and gravity are united) and therefore looks like a dark abyss, a metaphor, when we say plants come out of dark earth. 'Shyam' a word used earlier is really 'Purnam' – Full of potentialities.

Brahman (literally immensity) is another term used in Hinduism. This is 'Sat' (Being with capital B). It is the source and finality of all existing beings (small b) which emerge from the Being. Being is the unity of all, nothing is discernible or differentiable. As potential it is Purnam (Full to the brim) but when un-manifested it is described as Sunya (void). Thus it is both Sunyati Sunya (void-very much void) and Purnati Purna (Full- very much so).

The last line of verse 4 and $1^{st}$ line of verse 3 of Nasadiya Sukta state that only the wise (kavi) understands a seminal cord (Rashmi) that establishes the kinship between 'what is' and 'what is not'.

Brihadaranyak up (5.1.1) praises the 'fullness' of Brahman as the only Sat.

Om Tat Sat

# অথ পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীকথা

বাসবী চক্রবর্তী

আহা! আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করিল অর্থাৎ কিনা আমার এই শ্বেতশুভ্র পদযুগলে তাহার আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ। অকালেই যদি কোন স্বস্থ ব্যক্তি শারীরিক অক্ষমতাজনিত কারণে তাহার প্রিয় কার্যসম্পাদনে অসমর্থ হয় বিশেষতঃ আমারই কারণে তাহা হইলে আমার আনন্দ আর ধরেনা - এমনকি আমি হাসি লুকাইতে পারিনা।

সে আজ কবেকার কথা! সে কোন তরুণ হৃদয়ে আমার জন্য আকাঙখা প্রোথিত করিয়া দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করিতেছে -- সে কি আমার করতলগত হইবে না! শিকারী যেমন স্বগৃহের কোনে কোনে মুন্ড, শৃঙ্গাদি প্রদর্শন করিয়া চূড়ান্ত অহমিকা প্রকাশ করে আমিও সেইরূপে মানব হৃদয়ের দখলদারী লইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকি। বিশেষ করিয়া কাঁচা কাঁচা মুন্ডগুলি চিবাইতে আমার বড় সাধ। নবীন উজ্জ্বল মুখগুলি যখন ধূম্রজালে পরিবৃত হইয়া বড় আত্মশ্লাঘা ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করে, আমি মনে মনে হাসিয়া বলি - রোস রোস এই ধূম্র অচিরে তোমাদের পায়ের বেড়ি হইবে - ইহার নিকট তোমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত এবং ইহার সম্মুখে তোমাদের যুক্তি, বুদ্ধি, সন্তানের অশ্রুজল, চিকিৎসকের সাবধানবাণী সব কিছুই প্রবল বন্যার মুখে খড়কুটার ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। আজ আমি জয়ী।

আমি ধরাধামে অবতীর্ণ হইলাম কিরূপে? সে আমি জানিনা - আমার কুহকিনী মায়া ইতিহাসের ন্যায় চিরন্তন। এইমাত্র বলিতে পারি যে মহাদেব যদি একা গঙ্গাকে শিরোধার্য করিয়া মর্তে প্রবহমানা করিয়াছেন, তবে আমার জন্য বহুকোটি মাথা ঝুঁকিয়াই আছে। শুনিয়াছি আজকাল আমার বিরুদ্ধে প্রচার অত্যন্ত জোরদার - বিভিন্ন স্থানে করোটি প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া আমা হইতে শতহস্ত দূরে থাকিবার কথা বলা হইতেছে। আমি কিন্তু ভয় করিনা। ইহা সম্পূর্ণ অসম যুদ্ধ - কারণ চারিপাশে দেখিতে পাই আমার নবীন ভক্তকূল আমাকে ছাড়ে নাই। অথবা শুধুমাত্র নবীন কেন বলি --- প্রখর রৌদ্রদহন এবং মেরুপ্রদেশ হইতে বাহিত প্রবল শীত-লহরী উপেক্ষা করিয়া অগুন্তি পক্ক অথবা বিরলকেশ মস্তিষ্ক যে আমার সঙ্গসুধা উপভোগ করিতেছে তাহা কি দেখিতে

পাই না? আমি এখনও শেষ হাসিটি হাসিতেছি। মুষ্টিমেয় ভীরুপ্রকৃতির লোকজন আছে যাহারা অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু বুক ঠুকিয়া একথা বলিতে পারে না যে আমা সন্দর্শনে এখনও তাহারা দুর্বল মুহূর্ত্তে বিচলিত হয় না। তাহারা কোন প্রকারে আমার এই চক্রব্যূহ হইতে প্রস্থানপথের সন্ধান পাইয়াছে। তাহারা আমাকে ছাড়িয়াছে কিন্তু আমি তাহাদের ছাড়ি নাই। আমি তাহাদের বুকে আকাঙখারূপে চির বিরাজমানা।

তবে একটা কথা মনে মনে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। আমার বিজয়রথচক্র যে কখনও থামিয়া পড়ে নাই এমন নহে। ইউলিসিস নামে এক ব্যক্তির কথা মনে পড়ে। কথিত আছে তিনি নাকি বীর যোদ্ধা কিন্তু রকম-সকম দেখিয়া আমি তাহাকে ধূর্ত বলিয়াই মনে করি। অতল সমুদ্রের মধ্যবর্তী দ্বীপে বসিয়া সাইরেন ভগ্নিগণ সুরের মায়াজাল বিছাইয়া রাখিয়াছিল এবং শত শত নাবিক তাহাদের জালে পড়িয়া চিরবন্দীদশা যাপন করিত। ইউলিসিস মনস্থ করিলেন গান শুনিবেন কিন্তু ধরা দিবেন না। সঙ্গী নাবিকবৃন্দ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিল, শত উপরোধেও বাঁধনটি খুলিলনা আর বেণীটিও শুষ্ক রহিল। কিন্তু এই জনতার সরণীতে কজন ইউলিসিস আছে যে আমাকে ভয় করিতে হইবে?

অতএব হে জনতাবৃন্দ! আমার রূপবহ্নিতে আহুতি দাও - পরিবর্তে আমি তোমাদের শোণিতে তীব্র মাদকরস সঞ্চারিত করিব। তোমরা তো পরিণামদর্শী নহ, তাহা হইলে এই ধূম্রসাগরে ঝাঁপ দিতে বাধা কেন?তোমাদেরই ক্ষণিক সুখের জন্য আমার আগমন - আমাকে বরণ করিয়া ধন্য হও!!!

(মতামত সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত)

# বাঙালির ব্যবসা

## অরুণশংকর রায়

একজন মাড়োয়ারী ব্যবসাদার শুনলেন যে এক বাঙালিবাবু -- নাম রবীন্দ্রনাথ -- একখানা বই লিখে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন আর তার জন্য কয়েক লাখ টাকা পেয়েছেন। এই ব্যবসাদারের মনে কি ভাবনা এলো ?

### বাঙালির ব্যবসা

ব্যবসা জানেনা বাঙালিলোগ ছোড়ো এসব বাত,

রবিবাবুনে এ্যায়সা কিয়া জ্যায়সে দিনকো বনায়া রাত।

কোঁকড়া কোঁকড়া চুল লেকর সাধুবাবা এক বনা,

ব্যবসাবুদ্ধি তার জ্যায়সা আছে নেহি কুছ তার তুলনা।

দোরুপিয়াকা কাগজ লেকর বৈঠকে একলা ঘরমে,

হাবিজাবি সব লিখে দিলেন জ্যায়সা আয়া মনমে।

রবিবাবুসে আচ্ছিতরহ শিখো সকল ভাই,

দোরুপিয়া খরচ করকে দোলাখ কিয়া কামাই।

# হেসে নাও, দুদিন বই তো নয়!  (সংগ্রহ)

- কীরে হাঁদু, পরীক্ষা কেমন দিলি?

- ভালো।

- কী এসেছিল কোশ্চেন?

- ঐ তো, শেক্সপিয়ারের পাঁচটা নাটকের নাম লিখতে বলেছিল, আর সেগুলো কী নিয়ে লেখা, সেইটা বলতে বলেছিল।

- পারলি?

- হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও তো আমার মুখস্ত।

- কী লিখলি?

- লিখলাম, শেক্সপিয়ার খুব মামলেট খেতে ভালবাসত। একবার ডিমের মধ্যে হ্যাম পড়ে গেছিল বলে সেটা হয়ে গেল হ্যামলেট। তাই নিয়ে একটা নাটক।

- বাহ। আর?

- তারপর একদিন ওর মা রান্নাঘরে দুধ গরম করতে বসিয়ে বাথরুমে গেছিল, বলে গেছিল, বাবা, একটু খেয়াল রাখিস। সেই দুধ উথলে উঠে পুড়ে গেল। তাই নিয়ে লিখল  - ওথেলো।

- উরিব্বাস। তারপর?

- তারপর একবার ও আর ওর মা ভেনিসে গেছিল, সেখানে গিয়ে ওর মার গলার চেন হারিয়ে গেল। তাই নিয়ে একটা নাটক লিখল - মার চেন অফ ভেনিস।

- এক্সেলেন্ট। নেক্সট?

- ইস্কুলে ওদের গো অ্যাজ ইউ লাইক নিয়েও কী একটা নাটক লিখেছিল। আমি লিখে এসেছি, নামটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না। ঐ রকমই কিছু নাম।

- আর? পাঁচ নম্বর?

- আর একটা কী যেন? কী যেন, কী যেন? ও হ্যাঁ। শেক্সপিয়ারের মেয়ে হয়েছিল জুলাই মাসে , তার নাম দিয়েছিল জুলিয়া। তার একটা কাঁচি ছিল। সেই নিয়ে নাটক - জুলিয়া'স সিজার।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।
এমন সময় তিনজন লোক ট্রেনের দিকে দৌড়ে আসছে
দেখে একজন গার্ড টেনে-হিঁচড়ে তাদের মধ্য
থেকে দু'জনকে তুলতে পেরেছে।
ট্রেনের গতি বেড়ে যাওয়ায় বাকিজনকে তুলতে পারেনি।
গার্ড : ব্যাপার কী! এত কষ্ট
করে তিনজনকে তুলতে না পারলেও
দুজনকে তো তুলেছি,
অথচ আপনারা একটুও ধন্যবাদ দিচ্ছেন না ?
লোক দু'জন : ধন্যবাদ দিই কী করে!
যাকে ফেলে এসেছি, আসলে
উনিই ছিলেন যাত্রী।
আর আমরা এসেছিলাম
ওনাকে ট্রেনে তুলে দিতে।
**************************************************

Two well-dressed *Lawyers* went to an expensive restaurant. and ordered two drinks

and then got *Sandwiches* from their briefcases and began to eat them...

Waitress : Sorry Sir…!!! But you can't *Eat* your *OWN* food here... It’s against the rules...

The lawyers quietly looked at each other and *EXCHANGED* their sandwiches & continued their *Meals…..!!!*

(You can trust lawyers to find loopholes in any rules)

💚💚💚💚💚💚💚💚💚

MARWADI opened Sweets Shop & gave an *Advertisement...!!!*

Helper required................
Qualification : Must have *Diabetes…!!!*

💚💚💚💚💚💚💚💚💚

JUDGE : What is the Proof that you were not over *Speeding*?

MAN : My Lord, I was going to my father-in-law's house to bring back my *Wife*.

JUDGE : *Case Dismissed*

# Morning with a Koala in Australia

Nirmal Kumar Sinha, Ottawa, Canada

Koala is an iconic symbol of the isolated continent of Australia. Koalas are often mistakenly called as bears, but they are not bears at all. They are marsupials like kangaroos, wallabies, possums, opossums, wombats, and Tasmanian devils belonging to the family of the mammalian infraclass, who carry their prematurely born offspring and young (up to a year) in pouches of mothers. I was very fortunate to observe and photograph one of these bundles of joy in a wild life sanctuary, about 130km south of Melbourne, while travelling during the Australian autumn (March, April and May) of 2016.

**Figure 1. I love this particular type of deliciously fresh eucalyptus tree leaves and buds**

**Figure 2. I am really full with that satisfying meal and now kind of sleepy**

**Figure 3. Yes, indeed I am sleepy**

**Figure 4. I cannot keep my head up any longer**

**Figure 5. Please don't disturb me - I am in deep sleep**

Naturally, as an observer/photographer, I decided not to disturb her/him enjoying the deep sleep.

Koalas are tree-hugging marsupials with sharp claws, big round ears and dark oval noses as can be seen in the above pictures, particularly Figure 5. They live only in coastal areas of eastern and southern regions of Australia – primarily in the states of Queensland, new South Wales, South Australia and Victoria. Because of distinctive features that can be seen in the above pictures, the koala is recognised worldwide as a symbol of Australia. They normally inhabit open eucalyptus forests. Since there are over 700 species of flowering eucalyptus trees (or 'gum trees' as the Australians called them) and shrubs

native to Australia, Koalas have lots of choices. Consequently the leaves of eucalyptus trees make up most, if not all, of their diet. Since this eucalypt diet has very limited nutritional value and caloric content, koalas spend 3 to 4 hours a day to eat and then sleep up to 20 hours a day to digest the food. In fact, I learnt this lesson first hand, because I waited for a long time before my subject decided to finish her/his lunch.

Because of their life styles, koalas are largely slothful and lazy. They are asocial animals, and consequently bonding develops only between mothers and dependent offspring or underdeveloped newborn that crawl into their mother's pouches, where they stay for the first six to seven months after their birth. These young koalas, called by the Australians as 'joeys', are fully weaned around a year old.

We, the so called civilized animal of the world (sadly, in this instance, from England, Scotland and Wales) were the biggest enemies of the Koalas. These animals were hunted heavily in the early 20th century for its fur in Queensland and resulted in a public outcry that initiated a movement to protect the species. However, today the biggest threat to their existence is habitat destruction caused by expanding agriculture and booming urban development caused by immigrants mainly from south-east Asia.

## "In the Steppes of Central Asia" Samarkand

Subhalakshmi Basu Ray

"Samarkand" derived from Persian "asmara" or stone, is a historic city in the windswept Zaravshan River valley in Uzbekistan. One of the oldest cities on the Silk Road in Central Asia, at the confluence of many cultures, Samarkand is an UNESCO World Heritage Site.

We arrived in Samarkand in early April, in brilliant sunshine, but with a decidedly cool nip in the air! We were dressed for a late Canadian spring day. However, the winds picked up as the shadows lengthened, turning it uncomfortably cold and requiring frequent coffee breaks to warm up!

The European quarter of Samarkand, which dates back to the 19$^{th}$ century, is charming. The boulevards are shaded by mature plane trees. The colonial style

houses have intricate wrought iron balconies. The Soviet era apartment blocks often have an interesting feature, entire facades covered in mosaic designs!

Driving through the European quarter to reach the old city, our guide informed us that there had been an even older city called Afrosiob, dating back to 500 BC, which flourished until it was destroyed by the Mongols. Archeological excavations are ongoing at the site of its ruins and some interesting artefacts have already been unearthed.

Our first stop in the old city was “Gur-e Emir”, the mausoleum of Timur and some of his family members. Timur, the founder of the Timurid dynasty which ruled over a vast empire for almost 200 years, from the 14$^{th}$ century on, is a national hero in Uzbekistan. The previous day in Tashkent, I had the opportunity to visit an excellent museum dedicated to him and his glorious legacy. Of course, Timur enjoys a dubious reputation in regions where he waged war, plundered and laid waste! The recording of historical events is not without bias!

After centuries of neglect, the Soviet government initiated extensive restoration of the historic sites in Samarkand. Most are now complete. Though of Turkic/ Mongol descent, the Timurids embraced the courtly culture of the Persians. Their court language was Persian and their architecture drew heavily from Persian Islamic traditions .Defining features of Timurid architecture include monumental scale, multiple minarets, bulbous domes of turquoise blue and exquisite tile work, incorporating floral and geometric designs and inscriptions from the Koran.

**“Registan” or “desert”**

“Registan” or “desert” is a large public square framed by three madrassas of distinctive Islamic architecture, constructed at different periods of Timurid rule. It is spectacular, the sheer dimensions and scale of the monuments, the ethereal beauty of the mosaic tiles, the superior craftsmanship of the rich interiors and the gold leaf fretted ceilings, surrounded by well -tended lawns edged with flower beds of pansies and tulips. Breathtaking!

The madrassas and mosques have not been in use for years. Today some serve as museums. The one we visited had an impressive collection of traditional Uzbek musical instruments. Others are used as market places to showcase local handicrafts. We were interested in buying some mosaic tiles and were advised by our guide that haggling was mandatory!

Lunch was at Samarkand Restaurant, billed to be one of the best in town, serving both Russian and Uzbek cuisine. We were certainly fortunate to get a table without prior reservation! In our functional “outdoorsy” clothes, I felt out of place in an ambience of faded old world charm!

Our first stop after lunch was the Bibi Khanum Mosque. Dedicated to Timur’s favourite wife and fuelled by the great wealth amassed by him, after a successful campaign in India, it is reputed to have been the grandest of monuments built in his reign. It was set in a courtyard large enough to hold the entire male population of Samarkand for Friday prayers! By the middle of the 20$^{th}$ century, most of the mosque lay in ruins. It has now been partially restored, restoration still ongoing when we visited.

The day turned cloudy and cold. We drove past the 15$^{th}$ century Ulugh Beg Observatory commissioned by a grandson of Timur, an eminent astronomer and mathematician of his time. Apart from taking a few photographs, we decided against walking around and opted for coffee instead! We should have come better prepared for the weather and could only blame ourselves. Moral of the story: dress in layers. Living in Canada, we should have known better!

# Autumn Colours

## Yogadhish Das

As a boy growing up in rural West Bengal, I have fond memories of autumn - blue sky with fluffy white clouds, mild breeze creating dancing waves on verdant fields of rice paddy, fragrance of seasonal flowers. Poets have sung about these. Mother Nature puts on this look as if only to welcome Ma Durga. That was then and this is now. I seldom get to celebrate Durga Puja in my village anymore. But Nature has not failed me. Here in Ottawa, Nature explodes in a display of arboreal colours every autumn as if to celebrate our beloved Durga Puja with spectacular daytime fireworks! These photographs are a small tribute to this magic in Nature.

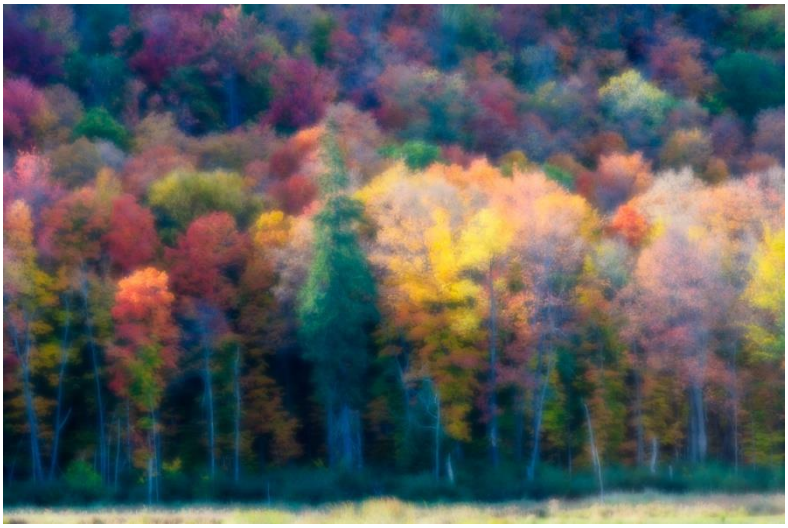

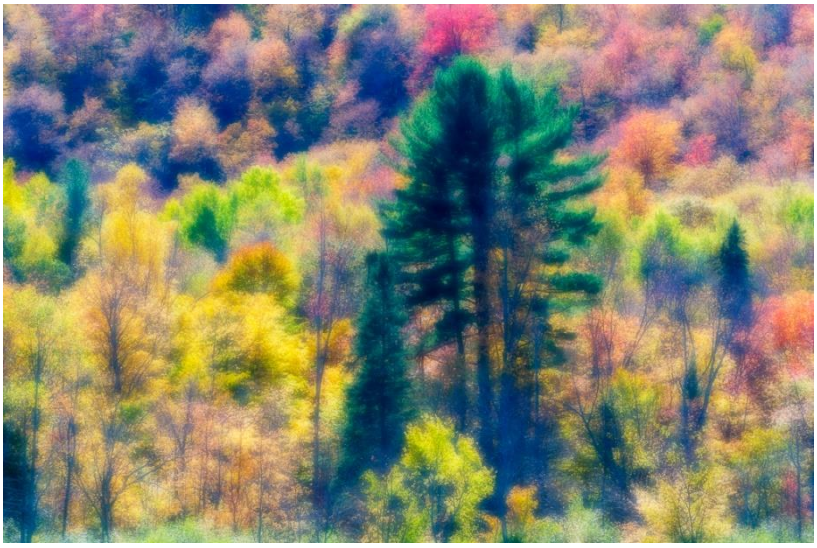

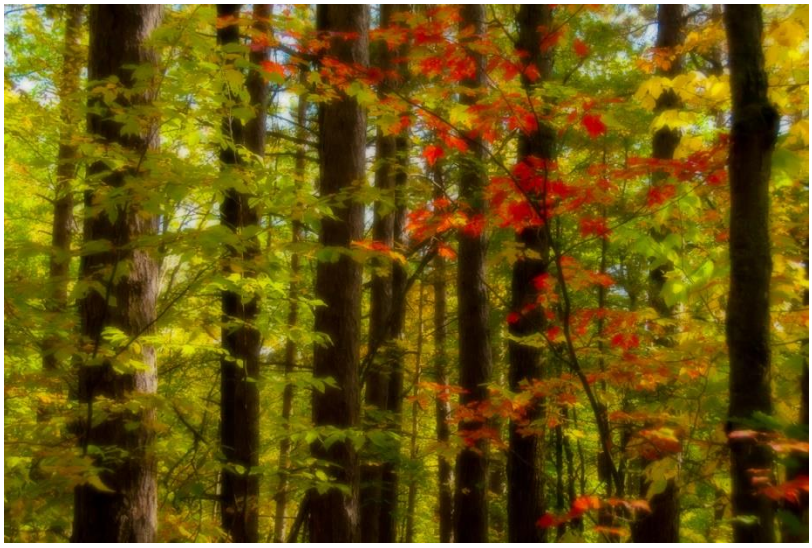

# পেরু দেখা

## ডক্টর ঝর্ণা চ্যাটার্জী

গত এপ্রিলে (২০১৬) আমার অনেক দিনের এক স্বপ্ন পূর্ণ হল । পেরু যাব কোন দিন, আর "মাচু পিচু" দেখব, হামা দিয়ে যেতে হলেও যতখানি ওপরে উঠতে পারি উঠব, সেই ইচ্ছে ছিল বহু বছর ধরে । তা ছাড়াও ওদেশে আরও এত আকর্ষণ যে আছে তা জানতাম না, জানার চেষটাও করি নি । না, সেটা ঠিক নয় – ন্যাজকা লাইনস সম্বন্ধে জানতাম, কিন্তু দেখব কোন দিন তা সত্যি কখনও তলিয়ে ভাবি নি।

দক্ষিণ অ্যামেরিকার উত্তর পশ্চিম দিকে পেরু, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে। কলাম্বিয়া আর ইকোয়েডরের দক্ষিণে আর চিলির উত্তরে। পেরুর উত্তরপশ্চিমে দুটি নদী মিলিত হয়ে আমাজন নদীর উৎপত্তি, তার পর সমস্ত মহাদেশ পার হয়ে পূবে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে মেশার আগে আরো অনেক, অনেক উপনদী তার সাথে মিলে সে বিরাট আকার ধারণ করেছে। আমাজন দৈর্ঘ্যে পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর জলের পরিমাণে বৃহত্তম। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৈচিত্র্যে আর সঙ্খ্যায় পেরু ও ব্রাজিলের আমাজন উপত্যকায় বৃষ্টি-অরণ্যের (রেইন ফরেস্ট) তুলনা নেই ।

যাই হোক, অটোয়া থেকে ১৫ই এপ্রিল তারিখ সকালে রওনা হয়ে লিমা পৌঁছলাম ১৬ তারিখে ভোর আড়াইটার সময় (অটোয়াতে তখন ভোর সাড়ে তিনটে)। একটু খানি বিশ্রাম করে, স্নান সেরে, ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম আধঘণ্টার জোর হাটাপথ লারকোমার শপিং সেন্টার দেখতে। প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে, পাহাড়ের গায়ে নীচু তলায় এই শপিং সেন্টার। ম্যারিয়ট হোটেলের সামনে বড় রাস্তা পার হয়ে তবে সেটার দেখা পাওয়া গেল। লিমার রাস্তাঘাট প্রশস্ত ও পরিস্কার, সুশৃঙ্খল যান-বাহন প্রবাহ। আর নিরাপদ। এখানকার দোকান-পসার ঝকঝকে। কাঁচা ফল বা স্যালাড খেতে কোনো বাধা নেই। তবে জলের ব্যাপারে সবাই সাবধান হতে বলেছে। পেঁপে, তরমুজ, কলা, আপেল, আনারস, কখনও বা আম ইত্যাদি ফল, নানা রকমের বাদাম, কিসমিস, দৈ, দুধ, নানা ধরণের সিরিয়াল – যেমন ওটস, কর্ণ ফ্লেক্স, আর ডিমের অমলেট বা সেদ্ধ বা স্ক্র্যাম্বল্ড ডিম প্রায় সব হোটেলের ব্রেকফাস্ট ব্যুফেতে থাকত। আর চা, কফি, ফলের রস – সবই হোটেলের দামের মধ্যে অন্তর্গত। কাজেই প্রতিদিন ভোরবেলা যতটা পারতাম খেতাম। কয়েকটা ডিনার আমাদের ট্যুর প্যাকেজের মধ্যে ছিল, কিন্তু বেশির ভাগ দিন লাঞ্চ খেতে হোত আমাদের নিজেদের খরচে। তবে ওখানকার ন্যুভো সল আমাদের ডলারের আড়াইভাগ, তাই বিশেষ গায়ে লাগত না।

লিমা শহর সমুদ্রের ধার থেকে বেশ কিছুটা ওপরে, এয়ারপোর্ট থেকে আসার সময়ে একটা ঢালু পথ ধরে ওপরে উঠে এসেছিলাম। লারকোমারে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউ দেখলাম আর ছবি তুললাম। ঢেউগুলো বালির ওপরে কি সুন্দর লেসের মত ডিজাইন তৈরী করছিল। একটা লম্বা বাড়ি জলের মাঝখান দিয়ে অনেকটা চলে গেছে, শুনলাম সেটা একটা দামী রেস্তোরাঁ – নাম 'রোজা নটিকা' (নীচে ছবি)। এ যাত্রা ওখানে খেতে যাবার সময় হবে না, তা জানতাম।

বিকেল বেলা একটু উইন্ডো শপিং করলাম – এখানে কি ধরনের জিনিস পাওয়া যায়, দাম কি রকম, তার একটু আন্দাজ পাওয়া গেল। আলপাকার লোমের জিনিসের ছড়াছড়ি, তবে তার দামও বেশ ভালই । বিশেষত বেবী আলপাকার লোমের তৈরী হলে। নরম এবং গরম। আলপাকা আর লামা, এদের দুই গৃহপালিত জীব এখানে সব জায়গায় দেখলাম, গরু-ছাগলের মতই সাধারণ। এরা এই দুই প্রাণীকে ঘাস ও জঙ্গলে ছেড়ে দেয়, যাতে স্বাভাবিক

ভাবে ঘাস কাটা, বা জঙ্গল পরিস্কার হয়ে যায়। তেমনি, শকুণ এবং কন্ডর এদের মৃত প্রাণী, বা হাড়গোড় জাতীয় আবর্জনা খেয়ে পরিস্কার রাখার জন্য কাজে লাগানো হয়।

রোজা নটিকা রেস্টোর‍্যান্ট

লিমার রেস্তরাঁতে সান্ধ্যভোজনের সময় স্থানীয় শিল্পীদের পেরুভিয়ান লোকনৃত্য

পরের দিন, ১৮ই এপ্রিল, আমরা গেলাম কুসকো শহরে, প্লেনে। এদেশে লিমা আর কুসকো হয়েই প্রায় সব জায়গায় যেতে হয়। প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ মাটিতে নামার সাথে সাথে বোঝা গেল ব্যাপার খুব সুবিধের নয়। সাগর ও সমতল ভূমি থেকে আমরা ১১,১৫০ ফিট ওপরে। নিঃশ্বাসের কষ্ট, মাথার যন্ত্রণা আর বমি-বমি ভাব কিছু কিছু লোকেদের জন্য খুব সাধারণ ঘটনা। এয়ারপোর্টে একটা ঝুড়িতে কিছু পাতা রাখা, মুখে দিয়ে চুষলে নাকি কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়। দু'তিনটে তুলে নিলাম, মুখেও রাখলাম, কিন্তু উপকার কতটা হল জানি না। পাতাটা হল কোকা পাতা, যা দিয়ে কোকেন তৈরী করা যায়, আর এখানকার লোকে আর ভ্রমণকারীরা প্রয়োজন মত তা দিয়ে চা বানিয়েও খায় । তবে

আমরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাসে চড়ে রওনা হয়ে গেলাম একটু নীচে, ইউকে শহরের ছবির মত সুন্দর সনেস্টা পসাডাস ডেল ইনকা হোটেলের দিকে। পথে অল্প সময়ের জন্য থামলাম একটা ছোট্ট জায়গায় -আওয়ানা কাঞ্চা সামাজিক প্রকল্প, কয়েকটি এডোবি স্টাইলের বাড়ি এবং সেগুলো ঘিরে বেড়া দেওয়া উঠোনে কয়েকটি লামা ও আলপাকা।

ঘরের মধ্যে বা বারান্দায় মাটিতে বসে উজ্জ্বল পোষাক-পরা মহিলারা ছোট্ট তাঁতে চাদর বুনছে, কেউ-বা সূতো কাটছে, বা সূতো রঙ করছে – সব প্রাকৃতিক, ভেষজ রঙ দিয়ে। পুরোটাই কুটীর-শিল্প। আলপাকার লোম দিয়ে তৈরী জামাকাপড় ওখানকার দোকানে বিক্রী হচ্ছিল। আমার শরীরটা ভাল লাগছিল না, তাই বাইরে বেঞ্চে বসে রইলাম। তারপর আবার রওনা, একেবারে ইউকের হোটেলে। যাবার পথে বাস থেকে দেখি অনেক নীচে উপত্যকায় গ্রাম, নদী – ভারী সুন্দর।

আমরা কুসকো উপত্যকারই আর একটা জায়গায় এক ঘণ্টার জন্য লাঞ্চ খেতে থেমেছিলাম। এই প্রথম এম্পানাডা খেলাম। অনেকটা সিঙ্গারার মত ব্যাপারটা, নানা রকমের পুর ভরা ছোট ছোট রুটি, বেকড। সত্যিই ভাল খেতে। তার পর বেশ কিছু শপিং করলাম সবাই ওখানে একটা খোলা বাজারে। আলপাকার স্কার্ফ জাতীয় জিনিস।

ইউকেতে পৌঁছে হোটেল দেখে সত্যি চোখ জুড়িয়ে গেল – কি ফুল, কি ফুল! রঙ্গীন ফুলের সমারোহ চতুর্দিকে, প্রাচীর-ঘেরা প্রাঙ্গনের এক কোণে একটি ছোট চার্চ, আর দূরে এন্ডিস পাহাড়ের কয়েকটি নীল-ধূসর চুড়া, কোনোটার মাথায় এক্টুখানি তুষার ঝলমল করছে। এত সৌন্দর্য দেখে শরীরের কষ্টও যেন ভুলে গেলাম। এই হোটেলটা আগে কোনদিন একটা মনাস্টারী ছিল। পরের দিন বাগানের একধারে স্থানীয় এক মহিলা বাড়ির তৈরী রূপোর গয়না বিক্রী করছিল, আমার বন্ধুদের সাথে আমিও দেখছিলাম। একটা ব্যক্তিগত দুঃখের কথা শুনতে পেয়ে বিক্রেতা অ্যাঞ্জেলা আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার গলায় একটা ছোট্ট গয়না পরিয়ে দিল – রূপোর চেনে ওদের রক্ষা-কবচের মত একটা রূপোর পেন্ডেন্ট। হৃদয়ের কোন ভাষার অনুবাদের দরকার হয় না। সব মানুষের একই ভাষা।

ইউকের হোটেলে ফুলের বাহার

তার পরের দিনে আমাদের মাচু পিচু দেখতে যাবার কথা, আর সেখানে থাকব পাঁচতারা সুম্যাক হোটেলে। সুম্যাক হোটেলের কথা একটু না বললে অসম্পূর্ণ থাকবে আমার এই বিবরণী। সর্বত্র চমৎকার সাজ-সজ্জা, অপূর্ব আতিথেয়তা। আর নৈশ ভোজের আগে ওদের একটি বিশেষ খাদ্য ও পানীয় কি করে বানায় তার ডেমনস্ট্রেশন হোলো। ট্রাউট মাছের সেভিচে আর পিসকো সাওয়ার। প্রথমটি নানা উপকরণ দিয়ে ম্যারিনেট করা বস্তুত কাঁচা মাছ, আর দ্বিতীয়টি এদের জাতীয় পানীয়। খুব কড়া পিসকো এ্যালকোহলের সাথে নানা জিনিস মিশিয়ে একটি ককটেল। দুটিই খুব জনপ্রিয়। কিন্তু বেরসিক আমি কাঁচা মাছ খাব না বলে অতিথিপরায়ণ ওরা আমাকে মাশরুম সেভিচে এনে দিল। আর আগে একদিন পিসকো সাওয়ার খেয়ে আমার প্রচণ্ড অম্বল হয়েছিল, তাই আমি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পানীয় লেমনেড চেয়ে নিলাম।

কিন্তু বিকেল বেলা সুম্যাক হোটেলে পৌছবার আগে প্রথমে আমরা কাঁচের ডোম দেওয়া ট্রেনে মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে গেলাম ‘এগোয়া কেলিএন্টিস’ (এর অর্থ – ফুটন্ত জল -বোধ হয় নদীর রূপ বর্ণনা করে) স্টেশনে, সেখান থেকে শহরের বাসে পাহাড়ের কোলে কিছুটা পথ উঠলাম। তারপর শুরু হোল গাইডকে অনুসরণ করে তিন ঘন্টা চড়াই-উতরাই, পাথরের উবরো-খাবরা রেলিং-ছাড়া উঁচু সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, নামা, আর তার মাঝে মাঝে থেমে থেমে এই অসামান্য ধবংসাবশেষ মন আর দুচোখ ভরে দেখা, আর সেই প্রাচীন ইনকাদের কুশলতা, বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি

অনুভব করা। রাজার শোবার ঘর, শষ্যাগার, মা ধরিত্রীর,সূর্যদেবের ও কনডরের মন্দির, বলির জায়গা, জলের ব্যবস্থা, পাথরের দেয়ালে ছাউনী বাঁধার ব্যবস্থা – বিস্ময়কর। ওরা সূর্য দেবতা, মা ধরিত্রী (পাচামামা – ঊর্বরতার ও ফসলের দেবী), কনডর পাখি, পর্বত, এদের পূজা করত। দেবতাদের সন্তোষের জন্য ফল, শস্য, জীব-জন্তু, এমন কি কখনো কখনো মানুষ বলি দিত।

ইনকাদের আগেও আরো অনেক উপজাতি পেরুতে বসবাস করত। ইনকাদের বিশ্বাস সূর্য দেব (ইন্টি) থেকে এদের উৎপত্তি। এদের আদি রাজধানী ছিল কুসকোতে, উত্তর ও দক্ষিণ অ্যামেরিকার তৎকালীন সমৃদ্ধতম শহরে, যেখানে মন্দিরের গা ছিল সোনার পাতে মোড়া। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত এরা কুসকো উপত্যকায় রাজত্ব করে। শেষ দিকে নবম রাজা ইনকা প্যাচাকুটেক অন্য উপজাতিদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে বিশাল ইনকা সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, কলাম্বিয়ার দক্ষিণ থেকে আর্জেন্টিনার উত্তর পর্যন্ত। একই সময়ে এরা পাহাড়ের মাথায় মাথায় অনেক প্রাসাদ এবং কৃষিক্ষেত্র ও উৎসবের স্থান তৈরী করে। মাচুপিচু তার মধ্যে একটি। 'মাচু' কথাটার অর্থ বুড়ো মানুষ, আর 'পিচু' হোল পর্বত। মাচু পিচু সমুদ্র থেকে প্রায় ৮০০০ ফিট ওপরে। ইউনেসকো ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে মাচুপিচুকে পেরুর ঐতিহাসিক সংরক্ষিত জায়গা এবং ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে 'ইউনেসকো হেরিটেজ সাইট' বলে ঘোষণা করে। ২০০৭ খৃষ্টাব্দে আধুনিক জগতের সাত আশ্চর্যের মধ্যে একটি বলে বিশ্বে এর পরিচয় স্বীকৃত হয়।

কলাম্বাসের সফল সামুদ্রিক অভিযানের পরে উৎসাহিত হয়ে স্প্যানিশরা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, তার পর মেক্সিকো ও মধ্য অ্যামেরিকায় এ্যাজটেক ও মায়া উপজাতিদের জয় করে। সাম্রাজ্য বিস্তার এবং ধনসম্পদের লোভে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ স্প্যানিশরা তার পরে দক্ষিণ অ্যামেরিকায় আসা শুরু করে। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে প্যাস্কুয়াল ডি এ্যানডাগোয়া

ইকোয়েডরের রিও স্যান জুয়ান পর্যন্ত আসে। তার দুবছর পরে ফ্র্যাঙ্কো পিজারো আরো দক্ষিণে আসার চেষ্টা করে, কিন্তু বিফল হয়। আরো কয়েক বছর পরে, ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সে আরো একটু এগিয়ে আসে। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে পিজারো ইনকা সাম্রাজ্যের সমুদ্রতীরবর্তী সমৃদ্ধ এলাকায় পৌঁছায় এবং পেরুর অগাধ খনিজ সোনা ও রূপার সন্ধান পায়। ইনকা সাম্রাজ্যের ধন-সম্পদ আবিস্কার করার পরে পিজারো তৃতীয়বার দক্ষিণ অ্যামেরিকায় অভিযানে আসে এবং ক্রমাগত আরো অনুপ্রবেশ করে। এর পরে কয়েক বছরের মধ্যেই সে অশ্বারোহী, তলোয়ারবাহী সৈন্যদের সাহায্যে অনায়াসে যুদ্ধজয় করে ইনকা রাজা আতাহুয়াল্পাকে বন্দী করে। রাজার মুক্তির লোভ দেখিয়ে স্প্যানিশ আক্রমণকারীরা ক্রমাগত আরো, আরো সোনা-রূপো আদায় করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বন্দী রাজাকে হত্যা করে। এর পরে ইনকারা আর কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারেনি।

সমুদ্রবিহারী স্প্যানিশ বিজয়ীদের জন্য কুসকোর অবস্থান খুব একটা সুবিধাজনক ছিল না, তাই তারা পরে লিমাতে তাদের রাজধানী স্থাপন করেছিল।

ইনকাদের স্থাপত্য, কৃষি বিদ্যা, ভূতত্ত্ব এবং জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান অসাধারণ উঁচু মানের ছিল। ভুমিকম্পে আধুনিক অনেক বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়লেও মাচু পিচুর ১৪৫০ বছরে তৈরী পুরোনো বাড়িঘর, দেওয়াল, বিশেষত এর ভিত্তি, এখনো অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে কোথাও কোন চূণ, বালি বা সিমেন্টের ব্যবহার নেই। শুধু পাথরের ওপর পাথর বসিয়ে তৈরী। শোবার ঘর, শষ্য জমিয়ে রাখার উপযুক্ত ঘর, মন্দির, ছাউনির চাল পাথরের দেওয়ালের সাথে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা, সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-বিধি, ক্রান্তি দিবস (মকর ক্রান্তি এদের কাছে বিশেষ দিন), সব কিছুর কথা এদের ভাবনা ও পরিকল্পনাতে ছিল। অশেষ প্রশংসনীয় এবং বিস্ময়জনক ।

মাচু পিচুর ধবংসাবশেষ

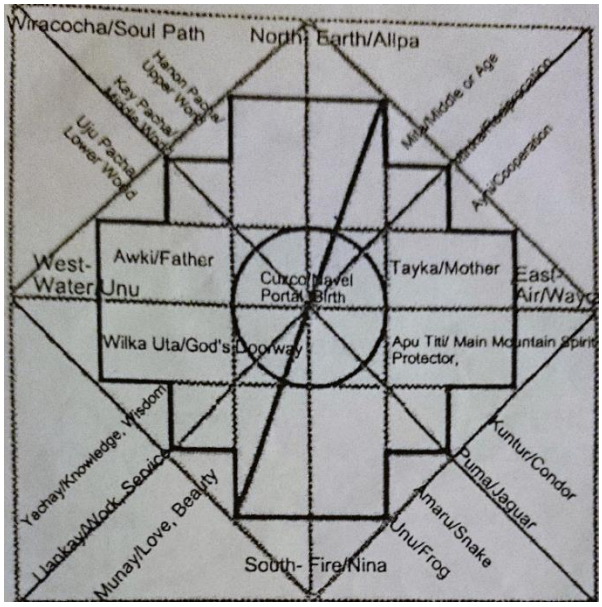


ওপরে বাঁ দিকে সূর্য মন্দির; ডান দিকে এ্যান্ডিয়ান ক্রস বা "চাকানা"। ইনকাদের কাছে এই চক্রের প্রত্যেকটি কোণ এবং লাইন অত্যন্ত পবিত্র ও অর্থপূর্ণ। চারটি কোণার অর্থ বায়ু (প্রকৃতির গতি), অগ্নি (দুর্বলতা জয় করা), জল (মুক্ত ধীর গতি) ও মাটি (দৃঢ়তা ও স্থিরতার শক্তি), আর মাঝের গোলাকার চিরন্তনতার প্রতীক। মাচুপিচুর ধ্বংসাবশেষে এই ডিজাইন আছে, আর এখনও কেচুয়ারা (ইনকা ও স্পঅ্যানিশদের বংশধর) অনেক গয়নায় এই ডিজাইন ব্যবহার করে। সূর্যের গতিপথ নির্ণয় করার জন্যও এই ক্রসের ব্যবহার ছিল।

পেরুতে বেড়ানোর দ্বিতীয় পর্বে আবার কুসকো, এবারে দু-রাত্রি থাকার জন্য। ২১শে এপ্রিল মাচু পিচু থেকে আমরা আবার কুসকো গেলাম, বাসে। সন্ধ্যে বেলায় বাস আমাদের নামিয়ে দিল একটা বড় রাস্তায়, সেখান থেকে হেঁটে

যেতে হোল হোটেল পর্যন্ত । বোধহয় পনেরো কি কুড়ি মিনিটের সামান্য চড়াই পথ। কিন্তু তার মাঝেই আমার এত নিঃশ্বাসের কষ্ট হতে লাগল, যে অন্তত তিনবার থামতে হল। আমাদের দলের ক্যাথি আর জো নিজে থেকেই থামল, অপেক্ষা করল আমার জন্য। গুড সমরিটন।

পরের দিন সকালে প্রথমে আমরা গেলাম স্যালিনেরি নুনের খনি দেখতে। নদীর জল পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে জমিয়ে রেখে সেই জল শুকিয়ে গেলে নুন তৈরী করা হয়। পুরুষাণুক্রমে স্থানীয় লোকে ওখানে বাস করে চলেছে, আর নুনের ব্যবসা করছে। রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা নামতে হল দেখতে, সিঁড়ি বলতে অসমান পাথরের উঁচু-নীচু ধাপ। দলের একটি মেয়ে আমাকে সাহায্য করল নিজে থেকেই।

স্যালিনেরি নুনের খনি

এর পরের দ্রষ্টব্য স্থান ছিল ‘মোরে’র বৃত্তাকার সিঁড়ি – সেখানে ইনকারা কৃষিকাজের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত বলে মনে করা হয়।

আমাদের বাসে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘোরা-ঘুরি প্রধানত গ্রাম আর চাষ-ক্ষেতের মাঝের রাস্তা দিয়ে হচ্ছিল। কিনোয়া, দু-তিন ধরণের ভুট্টা, আরো অনেক শষ্য নিয়ে চাষীরা তাদের ক্ষেতে ব্যস্ত। গরু, বলদ, ছাগল

দেখেছি মনে হয়। দেখেছি চাষী পুরুষ আর মেয়েদের। ছবি নিতে পারিনি চলন্ত গাড়ি আর দূরত্বের জন্য। যেতে যেতে 'শাইনিং পাথ' এর রক্তাক্ত বিপ্লবের ইতিহাস শুনলাম – ১৯৯২ খৃষ্টাব্দে এদের নেতা গ্রেপ্তার হবার পর থেকে অবশ্য এরা আর সক্রিয় নয়। বিশুদ্ধ কমিউনিজম আনার জন্য এরা কৃষক, সাধারণ নাগরিক থেকে শুরু করে, সরকারী কর্মচারীদের পর্যন্ত নির্বিচারে হত্যা করেছে। ইয়োরোপীয়ান ইউনিয়ন,অ্যামেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, পেরুর সরকার এদের হিংসাত্মক আন্দোলনের জন্য 'টেররিস্ট' দল হিসাবে গণ্য করে।

দুপুরে আমাদের কুসকো স্কোয়ারে নিয়ে গেল গাইড, ঘন্টা দেড় সময় দিল। তার মধ্যে আমাদের লাঞ্চ খেয়ে সামনের ক্যাথিড্রালের সিঁড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে । আমরা খুঁজে পেতে একটা রেস্তোরাঁয় গেলাম, দোতলার সরু ব্যালকনীতে বসলাম স্কোয়ারের দিকে মুখ করে। বেশ মজা লাগল। এদেশে স্যুপ চাইলে এত বড় বাটিতে এনে দেয়, যে দেখলেই পেট ভরে যায়। আর একটা ভাল জিনিস, ভেজিটেরিয়ান স্যুপ সত্যিই ভেজিটেরিয়ান, তাতে চিকেন বা বীফের স্টক থাকে না। অন্য খাবারের সার্ভিংও সেই রকম বিশাল। আমরা প্রায়ই ভাগ করে খেতাম, দুজনে মিলে একাটা পদ। ওরা আলাদা দুটো বাসনে এনে দিতো, বিলটাও সেভাবে করত, কোন ঝামেলা না করে। এখানে আমরা এস্পারাগাস স্যুপ খেলাম, আরও একটা কিছু। ততক্ষণে বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে। আমরা খাওয়া শেষ করে বেরোবার আগে অবশ্য বৃষ্টি থেমে গেল। স্কোয়ারে গিয়ে বেঞ্চে বসলাম। কয়েকজন স্থানীয় কেচুয়া (ইনকা ও স্প্যানিশদের বংশধর) মহিলা এসে আমাদের সোয়েটার ইত্যাদি কেনার জন্য ঝোলাঝুলি শুরু করল। শেষ পর্যন্ত কিনলাম দু'একটা জিনিস ।

সরু লম্বা ব্যালকনীতে খাবার আয়োজন

গাইড ফিরে আসার পরে আমরা ক্যাথিড্রালের ভেতরে ঢুকে সবকিছু দেখতে লাগলাম। সে কি ইতিহাস! ভিতরে ছবি তোলা নিষেধ ছিল, কিন্তু গাইডের বর্ণনা থেকে কল্পনা করে নিতে কোনো অসুবিধা হল না। বিজেতা স্প্যানিশরা মাতা ধরিত্রীর বদলে পরাজিত পেরুভিয়ান লোকেদের মাতা মেরীর পূজা করতে আদেশ দিল। তাদের বোঝাবার জন্য শিশু যীশুর মূর্তির রূপ হল পেরুভিয়ান শিশুদের মত। এদের হাতের কাজের নৈপুণ্য দেখে ছবি আঁকা আর কাঠের কাজের ভার দেওয়া হল তাদের ওপর। তারাও সেই সুযোগে নিজেদের বিশ্বাসের নানা উপাদান – যেমন কন্ডর, নেকড়ে, সাপের ছবি বড় বড় পেইন্টিং ও কাঠের কাজের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। যীশুর কোন কোন মূর্তিতে স্কার্টের মত পেরুভিয়ান পোষাক পরানো।

পরের দিন আমরা দেখতে গিয়েছিলাম কুসকোর সূর্য মন্দিরের ধবংসাবশেষ । সেই মাচু পিচুর মতই বিশাল বিশাল পাথরের ওপর পাথর ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে, চূণ, বালি, সিমেন্ট ছাড়া তৈরী দেওয়াল। ভাঙা জায়গা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মেরামত করেছে অন্য রকম দেখতে ছোট ছোট পাথর দিয়ে, যাতে বোঝা যায় এগুলো অপেক্ষাকৃত নতুন।

এর পরের উল্লেখযোগ্য ও দর্শনীয় স্থান হল পুনোর ভাসমান দ্বীপ। ২৩শে এপ্রিল আমরা আরো একটু উঁচু (১২০০০ ফিট) পুনোতে পৌছলাম – এবারেও বাসে করে, এবং লেক টিটিকাকার ধারে একটি অতি সুন্দর হোটেলে উঠলাম। আর তার পরদিন একটা স্টীমারে করে গেলাম উরস দ্বীপে। এই রকম দ্বীপ লেক টিটিকাকাতে ৯০ টা আছে শুনলাম। লেকের রীড দিয়ে তৈরী দ্বীপে লোকের চলাফেরার জন্য জমি রীডের, বাড়িঘর রীডের, নৌকো রীডের। ওদের মেয়েরা উজ্জ্বল জামাকাপড় পরে, তিন-চারটি থোপা দেওয়া টাসেল দিয়ে চুলের বিনুনী বাঁধে, আর নানা রকমের জিনিস হাতে তৈরী করে। সুন্দর ছুঁচের কাজ-করা ঘর সাজাবার জিনিস, পোড়ামাটি দিয়ে গয়না, কাপড়ের তৈরী থলে, আরো কত রকমের কুটীর শিল্প নিয়ে ওরা সারাক্ষণ ব্যাস্ত। ট্যুরিস্টদের কাছে ওরা এগুলো বিক্রী করে। ওদের মোড়ল আমাদের দেখাল কি করে ওরা ভাসমান দ্বীপ তৈরী করে। সূর্যের কিরণ (সোলার প্যানেল) থেকে ওদের প্রয়োজনীয় এনার্জী ওরা সংগ্রহ করে। আধুনিক সভ্যতার মাঝখানে অবিশ্বাস্য রকমের সহজ-সরল এদের জীবন যাত্রা।

লেক টিটিকাকা পেরু আর বলিভিয়ার মাঝে একটা সুন্দর শান্ত হ্রদ। ইনকাদের প্রাচীন কাহিনী অনুযায়ী স্রষ্টা ভিরাকোকা এই হ্রদ থেকে উঠে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ও মানুষ তৈরী করেন। (মানুষদের প্রথমে পাথর দিয়ে বানান, তার পর প্রাণ দেন)। একটি আন্তর্জাতিক প্রত্নতাত্ত্বিক সুংস্থা এই হ্রদের মধ্যে এক বহু পুরাতন (১০০০ থেকে ১৫০০ বছর আগের) মন্দির আবিষ্কার করেছেন। বলিভিয়া ও পেরুর সরকার ভবিষ্যতে এই মন্দির ওপরে তুলে আনবেন এমন পরিকল্পনা করেছেন।

আমাদের দলের অল্প বয়সী নেত্রী নিকোল কুসকো আর পুনোতে কাউকে স্যুটকেস তুলতে দেয়নি – নিঃশ্বাসের কষ্ট বা অন্য কোন সমস্যা হতে পারে বলে। ও সব সময়েই চেষ্টা করেছে আমাদের যাতে সুবিধে হয়। পুনোতে আমার ঘর ছিল দোতলায়। খুব কষ্ট হচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে। নিকোল নীচের তলায় ওর নিজের ঘর আমাদের ছেড়ে দিল, আর কোনও ঘর খালি ছিল না বলে। সেদিন সন্ধ্যেবেলা একটু অক্সিজেন নিলাম কষ্ট কমাবার জন্য। ওখানকার হোটেলে এর ব্যবস্থা থাকে এবং আমি ছাড়াও আরো অনেকে অক্সিজেন নিয়েছে।

পুনোর হোটেলের মাঠে গৃহপালিত আলপাকা ঘাস খাচ্ছে, ঘাস কাটা বা "মো" করাও হচ্ছে।

এবার পেরুতে বেড়ানোর তৃতীয় পর্ব। পুনো থেকে কুসকো হয়ে প্লেনে লিমা ফিরলাম। পরের দিন ভোরে (সত্যিকারের ভোরে, আসলে শেষ রাতে) উঠে তৈরী হয়ে ভ্যানে রওনা হলাম পোর্তো ম্যাল্ডোনাল্ডো এয়ারপোর্টের দিকে। লিমা থেকে প্লেনে পোর্তো ম্যাল্ডোনাল্ডো এয়ারপোর্টে পৌছে আলাপ হোলো এল্‌ভিস আর হিউগো, দুই প্রকৃতি-গাইডের সাথে। ওরা প্রথমে আমাদের এগারোজনকে  লাগেজ সহ বাসে তুলে কাছাকাছি একটা অফিসে নিয়ে গেল। সেখানে সকলের বড় স্যুটকেসগুলো জমা রেখে শুধু তিন রাত্রি ও চার দিনের মত জামাকাপড় ডাফল ব্যাগে গুছিয়ে নিতে বলল সবাইকে। আমরা আগে থেকেই ছোট ক্যারি-অনে সেই ভাবে প্যাক করে এনেছিলাম, বড় স্যুটকেস লিমার হোটেলে জমা রেখে,কাজেই আমাদের আর নতুন করে কিছু করতে হোলো না।  এল্‌ভিস আর হিউগো সারাক্ষণ মজা করত, আর আমাদের খ্যাপাত। মাঝে মাঝে ভুল দিকে পথ দেখিয়ে দিত, পেছন থেকে হঠাত কাঁধে হাত ছুঁইয়ে উল্টো দিকে তাকিয়ে হাসত। আমিও ওদের লাইফ জ্যাকেট পরতে গাফিলতি করা নিয়ে বকতাম।

ওখান থেকে একটা মাঝারি সাইজের বাসে ঘন্টাখানেক একটা কাঁচা, ভাঙ্গা-চোরা রাস্তা দিয়ে দোলার মত দুলতে দুলতে চললাম। দুদিকে জঙ্গল, এবং কলা আর পেঁপের বাগান। একবার উলটো দিকের একটা বাসকে জায়গা দিতে গিয়ে আমাদের বাসের চাকা গর্তে পড়ে আটকে গেল। ড্রাইভার আর দুজন গাইড নেমে চাকার তলায় পাথর ছড়িয়ে অনেক কষ্টে সেই চাকা উদ্ধার করল।  পথ শেষ হোলো এক বড়সড়, খরস্রোতা,বর্ষার ভরা নদীর ধারে পৌছে। ট্যাম্বাপোটা নদী। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ঘাটে নেমে চারদিক-খোলা স্টীমার-নৌকোয় উঠলাম। লাইফ জ্যাকেট পরতে হোলো। খুব সাধারণ সীট, আরামের নয়। একটু পরে (বোধ হয় বেলা আড়াইটে-তিনটে হবে তখন), আমাদের প্রত্যেককে একটা টিফিন কৌটোতে লাঞ্চ দেওয়া হোলো। আমার জন্য নিরামিষ। চলন্ত - মানে বেশ জোরেই, নৌকোয় ব্যালান্স করে বসে লাঞ্চ খাওয়া খুব সহজ হয় নি, তবে খিদে পেয়েছিল খুব, কাজেই ভালই লাগল। এরা এখানে দু বেলাই ভাত খায়। ঘন্টা দুই খরস্রোতা, ভরা নদীতে যেতে যেতে ওরা আমাদের দেখাতে লাগল টিয়ার (ম্যাকঅ) ও বাবুই পাখিদের উড়ন্ত ঝাঁক, আর নদীর তীরে কেম্যান কুমীর, নোনা মাটির খোঁজে আসা এ্যাগুতি আর

ক্যাবিব্যারার পরিবার। অনেক জায়গায় বড় বড় গাছ আধ-ডোবা, কোথাও নদীর ধারের গাছ-পালা পড়ে আছে মাটিতে। শুনলাম তার আগের সপ্তাহে বেশ বন্যা হয়েছিল, তার জন্যই এই অবস্থা।

ট্যাম্বোপাটা নদীতে আধ-ডোবা গাছ

নদীর তীরে মাটির ও শুকনো গাছ-পালার মধ্যে মিশে থাকা কেম্যান। এ শুধু এল্‌ভিস আর হিউগোর প্রখর দৃষ্টিশক্তির কল্যাণে আমরা দেখেছিলাম। অন্যান্য প্রাণীদের বেলাতেও একই।

এই বিচিত্র নৌকাবিহারের শেষ হোলো ট্যাম্বাপোটা প্রাকৃতিক আবাসন বা ইকো লজে পৌছে। সেখানে আবার অনেকগুলো কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে প্রথমে গেলাম লবিতে। আমাদের কোন ঘরে থাকতে হবে, কোনখান দিয়ে যেতে হবে, খাওয়ার ব্যবস্থা কোথায়, ইত্যাদি সব জ্ঞাতব্য বিষয় আমাদের বলা হোলো। পৌছবার মিনিট খানেকের মধ্যে বজ্র-বিদ্যুত সহ প্রবল বৃষ্টি নামল,– সে কি ঘোর ঘনঘটা! আমাদের পশ্চিম বাংলার বন-জঙ্গল-ভরা গ্রামে আষাঢ় মাসের মৌসুমী বৃষ্টির সাথে যদি কালবৈশাখীর দুরন্ত ঝড়ের সমন্বয় হয়, তাহলে যেমন লাগবে, অনেকটা তাই। কেবিনে যাবার নুড়ি-ছড়ান পথ জলে-কাদায় একাকার। ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে কোনোমতে ছুটতে ছুটতে গেলাম আমাদের কেবিনে। সামনের পর্চে দেখি দুটি হ্যামক টানানো রয়েছে। কিন্তু তখন হ্যামক দেখব কি? ঘন অন্ধকারে পুরোনো স্টাইলের চাবি দিয়ে দরজার তালা খোলা নিয়েও এক সমস্যা। পাশের ঘরের সদাশয় মহিলা ন্যান্সি ফ্ল্যাশ লাইট (টর্চ) নিয়ে বেরিয়ে এল, তার আলোতে দরজা খুলে ১৩১ "এ" নম্বর ঘরে ঢুকলাম ।

ক্যাবিবেরা। পাঁচটা ছিল ওখানে, কিন্তু এই ছবিতে শুধু তিনটে আছে।

সহজ, অনাড়ম্বর ঘরের ভেতরে তিনটা বিছানা, মাথায় গোল-করে গোটানো মশারি, মাঝে একটা ছোট্ট টেবলে কয়েকটি মোমবাতি আর লাইটার রাখা - আলোর একমাত্র সম্বল – আর আমাদের ফ্ল্যাশ্ লাইট। ইকো লজে সোলার প্যানেল দিয়ে এনার্জী তৈরি হয়, আর একটি জেনারেটর বোধ হয় আছে, যদি হঠাত কোন বিশেষ দরকার হয় তার জন্য। পেরুতে সর্বত্র কলের জল খেতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে আবার আরো এক কাঠি বাড়া, মুখ ধোওয়ার জন্য আলাদা জল জাগে করে রাখা আছে। জানালায় জাল লাগানো, কিন্তু কোনো কবাট নেই, তাই ঝড়ের হাওয়া ঘরে ঢুকে অবাধে খেলা করছে। আমি জানালার ধারের বিছানাটা নিলাম, আর আমার বান্ধবী নিল মাঝের বিছানাটা। ডিনার খেয়ে ঘরে ফিরে এলাম, তখনো ঝড়-বৃষ্টি সমানে চলেছে। এত ক্লান্ত ছিলাম যে রাত নটার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু উঃ, কি ঠান্ডা! সবাই বলেছিল রেইন ফরেস্টে গরম আর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া থাকবে, তাই নিয়ে এসেছি যত রাজ্যের হাল্কা জামা কাপড়! ভাগ্যিস একটা হুডেড ফ্লীস জ্যাকেট আর হাওয়া-কাটানো হুডেড জ্যাকেটও এনেছিলাম! তাকের মাথায় যে কম্বল আছে, তা দেখতেই পাই নি সেই রাত্রে। পরের দিন অবশ্য আর ভুল হয় নি। রাত বোধ হয় সাড়ে দশটায় ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ খুলে দেখি একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বুঝলাম বাইরে পথের ধারের বৈদ্যুতিক আলোগুলোও নিভে গেছে। আর অঝোরে বৃষ্টি। সে অদ্ভুত এক অনুভুতি।

ইকো লজের কুঁড়ে ঘর

অনাড়ম্বর শোবার ঘর – জানালায় কবাট নেই; ওপরে মশারি গোটানো রয়েছে

খাবার ঘরের ছাদ। কাঠের ফ্রেমে নারকেলের পাতা জাতীয় কিছু দিয়ে বোনা ছাউনী। এই লজের সব খাবার – সব্জী, ফল, মাংস ইত্যাদি স্থানীয় ফার্ম থেকে আসে, সব কিছু টাটকা ও স্বাভাবিক সার দিয়ে তৈরী। লজের বাড়তি খাবার ঐ ফার্মের জীবজন্তুদের জন্য দিয়ে আসে ওরা, তাই কিচ্ছু নষ্ট হয় না। নদীতে মাছ ধরা নিষেধ, কোন সময়ে একটি জলচর জীব গলায় বড়শি আটকে মরে গিয়েছিল, সেই থেকে।

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। আমি শুধু ইকো লজের কম্পাউন্ডের মধ্যে যে নিরাপদ ট্রেইল সেখানে একা একা ঘুরে বেরিয়েছি। একদিন রাতে আমাদের গাইডরা নিয়ে গেল এই সহজ পথেই, শুধু ফ্ল্যাশ লাইট সাথে নিয়ে। একবার হিউগো হঠাত আমাকে বলল ওর আরো কাছে যেতে, একেবারে নদীর ধারে, তারপর বলে "এবারে একটা উৎসর্গ (স্যাক্রিফাইস) হবে"। মহা ফাজিল! সবচেয়ে ভাল লাগল রাতের আকাশ দেখতে, আশ্চর্য রকমের ঘন নীল আকাশে অগুণতি তারা। দেখলাম ছায়াপথ আর দক্ষিণ গোলার্ধের চারকোণা নক্ষত্র-মণ্ডলী বা সাদার্ণ ক্রস – আমাদের ধ্রুবতারার মত। সত্যিকারের ভাল ট্রেইলে যেতে হয় নৌকো করে কিছুটা পথ গিয়ে, তারপর উচু-নীচু, অসমান, কর্দমাক্ত দুর্গম পথ। বুট পরে, ব্যালান্সের জন্য হাতে লাঠি নিয়ে হাঁটতে হয় – সেখানে এক ঘণ্টা ধরে আমি সকলের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারব না, তাই যাই নি। সেই পথ দিয়ে গেলে ম্যাকঅ পাখীদের দেখতে পেতাম, ওরা লোনা মাটি খেতে আসে। *ম্যাকঅদের ছবিটা ইন্টারনেট থেকে নেওয়া, আর অন্য সবগুলো ছবি আমার তোলা।* ট্যাম্বোপাটা ইকো লজ থেকে ২৯শে এপ্রিল আবার লিমা ফেরার জন্য রওনা হয়ে প্রথমে নদীপথে, তারপর বাসে পোর্তো ম্যাল্ডোনাল্ডো এয়ারপোর্টে পৌছলাম। ওখান থেকে কুসকো হয়ে লিমা গেলাম।

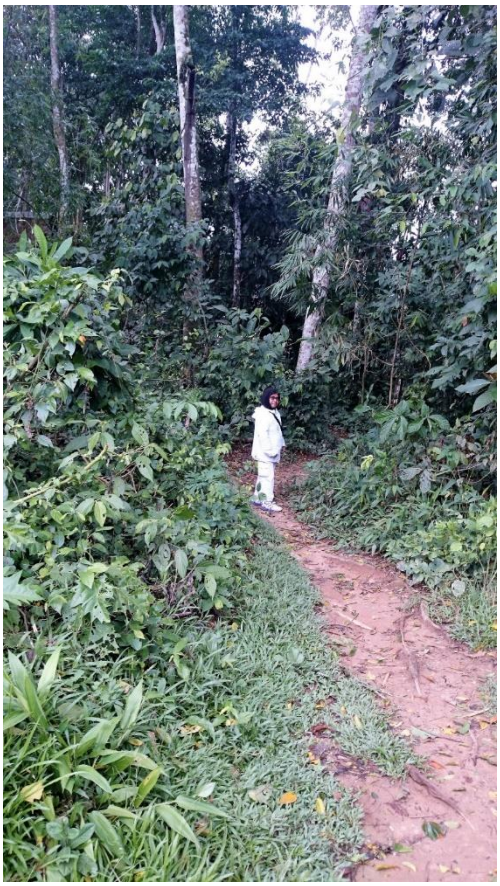

ইকো লজের মধ্যে হাইকিং ট্রেল; ম্যাক অ পাখিরা নুন খেতে এসেছে (ইন্টারনেট থেকে নেওয়া)

ওপরের আর নীচের ছবি দুটো প্লেন থেকে তোলা, পোর্তো ম্যাল্ডোনাল্ডো থেকে কুসকোর মাঝে। ঐ অঞ্চলে ছোট-বড় অনেক নদী, ছুটে চলেছে আমাজনের সাথে মিলবার জন্য। আর দেখতে পাওয়া যায় এন্ডিস পর্বতমালা, কোন কোন শিখরে তুষারের শুভ্র প্রলেপ আর পেছনে শাদা মেঘের স্তূপ, সব মিলিয়ে নয়ন-ভোলানো দৃশ্যপট। কি সুন্দর আমাদের এই পৃথিবী! যত দেখি তত মুগ্ধ হই।

লিমাতে পৌঁছোবার পরের দিন, ৩০শে এপ্রিল আবার যথারীতি সেই কাকপক্ষী জাগার আগে শেষ রাতে উঠে একটা ভ্যানে চললাম অ্যালকোহল-খ্যাত পিসকো শহরের দিকে। সেখানে পৌছে একটা ছোট্ট এয়ারপোর্টে গিয়ে ছোট্ট এক হভার ক্র্যাফটে উঠলাম। বেশ অনেকক্ষণ পরে পাহাড়ের মাথায় এক মোটামুটি সমতল জায়গায় পৌছে সেই ছোট্ট এয়ারপ্লেন শুরু করল তুর্কী নাচন – ওপরে-নীচে, বাঁয়ে -ডাইনে, কোণাকুনি, সব রকমের গতি-বিধি, হঠাত হঠাত। আমরা বারো জন যাত্রী, আর দু জন পাইলট। বারো জন যাত্রীই জানালার ধারে বসা। কারণ আমরা গিয়েছি রহস্যময় ন্যাজকা লাইনস দেখতে। দেখলাম অনেক ছবি। পাখি, মানুষ, তিমি, বিশাল বিশাল জ্যামিতিক আকৃতি ও আকার – মাইলের পর মাইল জুড়ে পাথরে খোদাই করা। এক মহিলা যাত্রীর বিবমিষা এতই বেশি হোল যে বেচারী চোখ বন্ধ করে বসে রইল সারাক্ষণ। আধঘণ্টা খানেক দেখার পর ফিরে এলাম আমরা পিসকোতে, তারপর আবার লিমাতে। আমি প্রধানত মনের জোরে সব শারীরিক অস্বস্তি দমন করতে পেরেছিলাম। ভাবব না, কিছুতেই ভাবব না। তবে অত দুলুনির আর গতি পরিবর্তনের মধ্যে ছবি নেওয়াও সহজ নয়। বেশি ছবি তুলতে পারিনি।

ন্যাজকা লাইনস প্রায় ৪৫০ স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে আঁকা বা পাথরে খোদাই করা হাজার হাজার ছবি। মাকড়শা, হামিং বার্ড, পেলিক্যান, বাঁদর ও তিমির মত প্রাণীর ছবি, কাল্পনিক মূর্তি, আর জ্যামিতিক আকার, ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, ইত্যাদি – এই সব খৃষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ৫০০ সালে ন্যাজকা নামে এক প্রাগৈতিহাসিক উপজাতির নির্মিত এটুকুই জানা। এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা একমত নন। আনেকে এগুলো ‘এলিয়েন’দের বিমানপোত নামবার সুবিধার জন্য বলে বিশ্বাস করেন, আবার অন্য অনেকে এই ছবিগুলো এক বিশাল ক্যালেন্ডারের কাজ করত বলে মনে করেন। জলের প্রয়োজনের সাথে এই গুলোর সম্পর্ক আছে, সেটাও অনেকে বলেছেন। কোনোটাই এখনোও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় নি।

ছোট্ট প্লেনের মধ্যে বসে ন্যাজকা লাইনস দেখা; নীচে ন্যাজকা লাইনস – বাঁ কোণে পাখি

তার পরের দিন, ১লা মে আবা র ঘরে ফেরা। খুব কষ্ট হোলো সুদীর্ঘ যাত্রা-পথে। কিন্তু মন ভরা। "যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই"।

পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের অনেক, অনেক জায়গায় বেড়াতে গেছি, অপূর্ব সব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তার সাথে সাথে ভাষা,সংস্কৃতি, ধর্ম নির্বিশেষে সর্বত্র সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের পরিচয় ও তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার পেয়ে আত্মিক আলোতে মন আলোকিত হয়ে গেছে। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের পাতা সামনে খুলে গেছে – নতুন করে মানুষের ইতিহাস জেনেছি, মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আরও ভালবাসতে শিখেছি। অনেক দেখেছি, কিন্তু এই শ্যামলী পৃথিবী মায়ের বুকে আরও যে কত রত্ন সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে! পথে পথে রয়েছে মানব-সভ্যতার তীর্থস্থান। তাই আমারও আরও অনেক কিছু দেখার আছে। কৌতূহল আর বিস্ময়ের শেষ নেই। চোখ ভরে আরও দেখতে, প্রাণ খুলে আরও শিখতে চাই। এই ভ্রমণ-তিয়াসা নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই যতদিন পারি।

# ভিয়েতনামে লাল-সেলামে

*গৌর শীল*

কোলকাতায় স্কুল-কলেজের দিনগুলো কাটতো বেশ দ্রুতগতিতে । সেই সময়ে মাঝেমাঝেই রাস্তার দেওয়ালে দেখা যেত নানারকম রাজনৈতিক ও সামাজিক স্লোগান, তার মধ্যে **"ভিয়েতনাম, লাল-সেলাম"** ছিল বেশ পরিচিত। এই স্লোগান থেকে যে message-টা পাওয়া যেত সেটা ছিল: সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে চলছে ভিয়েতনামের মুক্তিবাহিনীর জোর লড়াই আর সেই সংগ্রামে জয়ী হচ্ছে যে সব অসমসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা তারা আমাদের নমস্য।

সেই সময় থেকেই "ভিয়েতনাম" নামটার সঙ্গে লাল সেলামের দেশের ঐ Image-টা থেকে

গিয়েছিল বোধহয় মনের মধ্যে। ভিয়েতনামের বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছরের ইতিহাসেও Ho Chi Minh-এর মুক্তিবাহিনীর অদম্য বীরত্বের অনেক প্রমাণ মিলবে যার চূড়ান্ত পরিণতি ১৯৭৫ সালে তৎকালীন দক্ষিণ ভিয়েতনামের অবলুপ্তি । তারও আগে ১৯৫৫ সালে Dien Bien Phu-র যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর ফরাসী সরকার ভিয়েতনাম থেকে বিদায় নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু অশান্ত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার অজুহাতে তারা ভিয়েতনামকে দু ভাগে বিভক্ত করে - তখন তৈরী হয় উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম । উত্তর ভিয়েতনামের কম্যুনিষ্ট সরকার (Viet Cong) হো চি মিনের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভিয়েতনামে অভিযান চালাতে থাকে । তাদের অগ্রগতি রোধ করতে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য চায়। আমেরিকা এগিয়ে আসে ১৯৬৪ সালে। তখন থেকে দশ বছর ধরে উত্তর ভিয়েতনামে বারবার বোমাবৃষ্টি, মাইন বসানো ও সেনা পরিচালনা করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। কিন্তু Viet Cong সৈন্যরা লড়াই চালিয়ে যায়।

১৯৭৩-এ আমেরিকাও বিদায় নেয় অনেক ক্ষয়ক্ষতির পরে । তার দুবছর পরে, ১৯৭৫-এ দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের পতন হয়। Viet Cong-এর ট্যাঙ্কবাহিনী Imperial Palace অধিকার করে। Saigon শহরের নতুন নামকরণ হয় Ho Chi Minh City (HCMC)। তখন থেকে ভিয়েতনাম এক অবিভক্ত রাষ্ট্র।

Saigon বা HCMC থেকে ৫০ মাইল দূরে এক বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান আছে। মাটির নীচে সেটা এক অন্ধকার অপরিসর গলিপথ। সোজা দাঁড়িয়ে চলা যায় না সেখানে, তাই এগোতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে। সামনে-

পিছনে কি ওপরে কিছু দেখা যায় না। ভেতরে কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। দু পাশে দেওয়াল উঠে গেছে, হাতের ছোঁয়ায় বোঝা যায়।

পাতালপুরীর এই সুড়ঙ্গে আমরা কয়েকজন নেমে এসেছি একটা অল্প চওড়া প্রবেশপথ দিয়ে। সামনে কিছু লোক আছে, পেছনেও কয়েকজন। সামনে যে আছে তাকেই অনুসরণ করে এগোচ্ছি শনৈঃ শনৈঃ। একটা ধারণা আছে যে পঞ্চাশ মিটার মতো এগিয়ে

তারপর বাঁদিকে ঘুরলেই কাছাকাছি একটা ওপরে ওঠার সিঁড়ি পাওয়া যাবে। সেই মতো এগিয়ে খানিক পরে বাঁদিকে ঘুরলাম সামনের লোককে follow করে। তারপর হাঁটু ঘষে ঘষে আবার এগোই। বেরিয়ে যাবার সিঁড়ি এখনো আসেনি। বাতাস একটু ভারী হয়ে আসছে যেন।

এমন সময় সামনে থেকে গলার আওয়াজ ভেসে এলো।

১ম কণ্ঠ (পুং): It is a dead end here !

২য় কণ্ঠ (পুং): Something is flying overhead

এইসময় একটা ডানা ঝাপটানোর শব্দ পেলাম মাথার ওপরে। কোন বাদুড়-টাদুড় উড়ে গেল বোধহয়। সামনে কেউ তার Cell Phone-এর আলোটা জ্বালিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড পরে সেটাও নিভে গেল। আবার সেই দমবন্ধকরা অন্ধকার।

১ম কণ্ঠ : Anybody there ?

৩য় কণ্ঠ (মহিলা) : Hello !

১ম কণ্ঠ: We are at a dead end here.

৩য় কণ্ঠ: I can see some opening ahead.

১ম কণ্ঠ: I probably took a wrong turn. I have to back up a little.

আমরা পিছনে একজায়গায় চুপচাপ থেমে আছি, মনের মধ্যে প্রবল suspense নিয়ে।

নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। মিনিট দুয়েক কাটলো এইভাবে। কপালে ঘাম জমছে টের পেলাম। এই সময় বাঁদিকের এক গলিপথে আবছা আলোর আভাস ! তার পরেই পরিচিত গলার আওয়াজ ভেসে এলো আমাদের আশ্বস্ত করে।

১ম কণ্ঠ: We are OK. The stairs are 20 feet ahead. Please follow the light from the mobile phone.

বলা বাহুল্য একটা আনন্দ ও হাঁপছাড়ার গুঞ্জন উঠলো বিভিন্ন কণ্ঠে। আমি মনে মনে বললাম "যুগ যুগ জীও" ! তার পর মিনিট তিনেক হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া গেল, সামনে একটা সিঁড়ি। মাথার ওপরে চৌকোনা আকাশ। দুহাতে ভর দিয়ে একে একে ওপরে উঠে এলাম সকলে। উজ্বল দিনের আলোয় শ্বাসপ্রশ্বাস আবার স্বাভাবিক হোল।

**Cu Chi Tunnel**

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা নিয়ে যে সুড়ঙ্গ থেকে আমরা এইমাত্র বেরিয়ে এলাম সেটা ছিলো সায়গনের Cu Chi Tunnel-এর একটা অংশ। এই টানেল পর্যটকদের কাছে এক বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। মোট দুশো দশ মাইল এর দৈর্ঘ। তার কিছুটায় বহিরাগত ভ্রমনকারীদের

সুবিধার জন্যে প্রবেশপথগুলি একটু বেশী চওড়া করা হয়েছে-- সেই অংশেই ঢোকা যায়।

এর প্রবেশ ও বেরিয়ে আসার রাস্তাগুলো এমনভাবে গোপন করা ছিলো যে টানেলের অতি অল্প অংশই আবিষ্কার করেছিলো আমেরিকার সেনানীরা - যদিও প্রায় ১২৫ মাইল সুড়ঙ্গপথ তাদের বিভিন্ন ঘাঁটির নীচে দিয়ে ছড়িয়ে ছিলো। লাল সেলাম !

কু চী টানেলকে সেলাম জানিয়ে সায়গনে ফিরতে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে। দেখার মতো আর্ট গ্যালারী ও মিউজিয়ম ইত্যাদি বন্ধ হয়ে গেছে। তবুও হোটেলে না ফিরে আমরা downtown এলাকায় নেমে পড়লাম। আমরা যেতে চাই সায়গনের উচ্চতম অট্টালিকা Bitex Tower-এর ওপরতলায়, যেখান থেকে একটা ৩৬০ ডিগ্রী view পাওয়া যাবে শহরের। কিন্ত এখন আমাদের সঙ্গে কোন গাইড নেই। নিজেদেরই ব্যবস্থা করতে হবে Bitex Tower-এ পৌঁছানোর। আপনা হাথ্ জগন্নাথ !

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে tower-টা দেখা যাচ্ছে। খুব দূরে নয়। আবার হেঁটে যাবার মত তত কাছেও নয়। ঠিক করলাম একটা Taxi নিয়ে চলে যাই।

এবার Taxi খোঁজা। কিন্তু কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে কোন খালি Taxi ধরা গেল না। রাস্তার পাশে এক বুড়ী ফেরীওয়ালী তার জিনিষপত্র বিক্রী করছিল, তার কাছে আমি জানতে চাইলাম কাছাকাছি ট্যাক্সী স্ট্যান্ডটা কোথায়। সে কি বুঝলো জানি না, তবে আমরা Bitex Tower যাবো শুনে কাছে দাঁড়ানো একটা motorcycle (scooter) দেখিয়ে বললো যে তার ড্রাইভার আমাদের দুজনকেই পেছনে বসিয়ে পৌঁছে দেবে দশ মিনিটে, ভাড়া পড়বে মোট দেড় ডলার। আমরা খুব সাবধানে উঠে বসলাম ড্রাইভারের পিছনে জড়সড় হয়ে। তাকে বললাম : Go slowly। দশ মিনিটের পুরো সময়টা প্রায় নিঃশ্বাস চেপে বসে কাটালাম। টাওয়ারে পৌঁছে তবেই আবার সব স্বাভাবিক। মনে আছে যে Bitex Tower-এর নীচেই একটা ট্যাক্সী স্ট্যান্ড থাকায় observatory থেকে নেমে এসে আমরা সহজেই হোটেলে ফিরে আসি।

পরের দিন সারাদিনের guided tour -- Mekong Delta Excursion। সায়গন থেকে প্রায় সত্তর কি. মি.। বাসে উঠে শহর, কয়েকটা গ্রাম ও বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত ছাড়িয়ে মেকং নদীর ব-দ্বীপ এলাকায় পৌঁছানো গেল। একটু পরে আমরা একটা স্টিমার-বোটে চেপে গেলাম তিনটি বিভিন্ন দ্বীপে। সব জায়গায় কিছু কিছু interesting activity ছিল, কোথাও rowing, কোথাও python নিয়ে নাড়াচাড়া, কোথাও coconut candy-র কারখানা ঘুরে দেখা। তার পর মধ্যাহ্নভোজের বিরতি। খাওয়ার পরে একটা বাগানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম। ঠিক পাশেই ছিল একটা অগভীর চৌবাচ্চার মতো জায়গা. তার নীচে কয়েকটা ছোট ছোট কুমীর শুয়ে ছিল। দুজন লোক লম্বা লম্বা লাঠির ডগায় মাংসের টুকরো বেঁধে কুমিরের মুখের কাছে বাড়িয়ে দিলে তারা লাফিয়ে উঠে খাবারটা মুখে টেনে নিচ্ছিলো।

Small rowing boat on Mekong River

এতক্ষণ আমরা ছিলাম Unicorn Island-এ। সেখান থেকে আবার boat-এ উঠে My Tho টাউনে নামলাম। সায়গনে ফেরার বাস ছাড়লো এখান থেকেই। দেড় ঘন্টা লাগলো ফিরতে। Bus terminus থেকে হোটেল পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ।

১৯৭৫ সালে দক্ষিন ভিয়েতনামের অবলুপ্তির পরে তামাম ভিয়েতনামের রাজধানী শহর হোল Hanoi। ভিয়েতনামের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনোহর সমন্বয় ঘটেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে -- স্থাপত্য তার অন্যতম। আর Ho Chi Minh Mausoleum Complex এই সমন্বয়ের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই Mausoleum সকাল ৭:৩০ থেকে বেলা ১১:৩০ অবধি খোলা থাকে, তখন গিয়ে Uncle Ho-কে লাল সেলাম জানাতে রোজ হাজার হাজার স্বদেশ-বিদেশের মানুষ আসে - আমরাও সেই বিশাল জনতার সঙ্গে ভিতরে ঢুকে স্ফটিক-স্বচ্ছ কফিনের মধ্যে শায়িত Ho Chi Minh-এর দেহটি দেখলাম যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে। Mausoleum-এর ভেতর-বাইরে শত শত রক্ষী দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু তারা বিদেশী ট্যুরিষ্টদের কোন সাহায্য করতে অপারগ - সব কথাতেই বলে "No"।

**Crowds lining up in front of Mausoleum**

এক দিনের Guided Tour নিয়ে Hanoi থেকে ঘুরে আসা যায় ১৮০ কি. মি. দূরের Halong Bay। এই UNESCO World Heritage Site তার পান্নাসবুজ জলে অর্ধ-মগ্ন অজস্র চুনাপাথরের দ্বীপ ও গুহার সম্ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পৌরাণিক কাহিনী বলে ড্রাগনদেবতারা এগুলো সৃষ্টি করেছিলেন চীন দৈত্যের কবল থেকে ভিয়েতনামকে রক্ষা করতে। Hanoi থেকে ট্যুরিষ্ট বাসে চেপে সাড়ে তিন ঘন্টা পরে Halong-এ পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের ওঠানো হোল পাল-তোলা জলযানে (traditional junk boat)। বোট ছাড়বার পরেই লাঞ্চ -- পরিবেশন করা হলো সুস্বাদু ভিয়েতনামী খাবার। খেতে খেতেই চার পাশের অনন্যসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি উপভোগ করলো যাত্রীরা।

Junk Boat Cruising in Halong Bay

প্রায় দু ঘন্টা ধরে Halong bay-র বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ করে থামল আমাদের জলযান। সামনে অনুচ্চ পাহাড়ের মত চুণাপাথরের গুহা, গুহার খানিকটা জলের ওপরে, বাকীটা তলায়। Junk থেকে নেমে ওঠা হোল ছোট দাঁড়ঠেলা নৌকায়, তাতে চড়ে গুহার ভেতরে ঢুকলাম আমরা। আবছা আলোয় গুহাগুলোর দেওয়াল ও ছাদে প্রকৃতির লক্ষ লক্ষ বছরের কারুকাজ চোখে পড়লো। আশঙ্কা ছিল বাদুড়জাতীয় প্রাণীর বাসা থাকতে পারে ওখানে, তবে ভাগ্যক্রমে তারা ছিল না।

Halong Bay থেকে Hanoi ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে এলো। সেই রাতেই আমরা Hanoi থেকে ট্রেনে রওনা দিলাম ভিয়েতনামের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে। Overnight journey। ওখানেই আমরা ভিয়েতনাম ছেড়ে যাব ঠিক হয়ে আছে। কিন্তু তার আগে ঐ সীমান্তের কাছাকাছি Sapa Village নামে একটা পাহাড়ী গ্রামে ঘুরে আসা যায় সম্ভবতঃ।

Guidebook-এর ভাষায়: Sapa today is the tourism centre of the northwest... with mountains towering above on all sides, spectacular views emerge on clear days...local hill-tribe people fill the town with colour.

Hanoi থেকে ট্রেন এসে থামল শেষ স্টেশনে ভোর ছটায়। আমরা মালপত্র নিয়ে বাইরে বেরোবার তোড়জোড় করছি এমন সময়ে একজন Bus-এর দালাল এসে জানতে চাইলো Sapa যাবো কিনা। তার সঙ্গে দরাদরি করে মাথাপিছু পাঁচ ডলার ভাড়া ঠিক হলো। তারই সাহায্যে লাগেজ টেনে এনে একটা Minibus- তোলা হোল। এখনো বাস ভর্তি হয়নি, আমরা বসে অপেক্ষা করছি। দালাল লোকটা ভাড়া চাইতে এলে তাকে বলে দিলাম Sapa পৌঁছে ভাড়া দোব, এখন নয়। সে ড্রাইভারকে বলে দিল পরে ভাড়া কালেক্ট করতে।

এইসময় একজন ইয়ং মেমসাহেব মহিলা খুব গাঁইগুই করছিল। তাকে ঠকিয়ে দশ ডলার ভাড়া নিয়েছে, সে পয়সা ফেরত চায়। কিন্ত কে ফেরত দেবে ? ড্রাইভার চুপচাপ বসে রইলো।

কিছুক্ষণ বাদে ছাড়লো বাস। পাহাড়ি চড়াই পথ, জায়গায় জায়গায় কঠিন বাঁক। বাস উঠছে মন্থর বেগে। ক্রমশঃ আমরা ওপরে উঠছি, একপাশে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে রেলিঙ-ঘেরা খাড়াই জমি নীচে নেমে

গেছে । কখনও দু একটা ছাড়াছাড়া বাড়ি চোখে পড়লো। Sapa village সমতল থেকে ১৫০০ মিটার ওপরে । ফরাসী আমলে এই hill station তৈরী হয়েছিল ১৯২২ খৃস্টাব্দে।

বাস থেকে মালপত্র নামাচ্ছি এমন সময় মধ্যবয়স্ক এক দেহাতিনি পশারিনি পাশে এসে দাঁড়ালো তার পশরা নিয়ে। মনে মনে বললাম : এসে গেছে। আমার একটা প্রশ্ন ছিল তাই তাকে জিগ্যেস করলাম Cat Cat village-টা কোন দিকে আর কত দূরে। সে একটা রাস্তা দেখিয়ে বললো তিন কিলোমিটার। আমি হাতের লাগেজগুলো দেখিয়ে বললাম: এগুলো নিয়ে তো হাঁটা যাবে না, আগে এগুলো কোথাও রাখা যাক। তখন সেই মহিলা ব্যবস্থা করে দেয় কাছেই একটা গ্রোসারি ষ্টোরে আমাদের লাগেজ ঘণ্টা দুয়েক রেখে দেওয়ার - কিছু ফী দিয়ে অবশ্য।

View of Terraced Ricefields in Sapa

এবার Cat Cat village-এর দিকে হাঁটা শুরু করলাম। পাহাড়ের গায়ে থাক থাক ধানক্ষেত সবুজ ঘাসের সিঁড়ির মতো শোভা পাচ্ছে। ক্যামেরায় কিছু ধরা রইলো। দূরে Fansipan Mountain-এ ওঠার সদ্য নতুন cable car গুলো ওপর নীচ যাতায়াত করছিলো। কিন্ত আমাদের হাতে সময় ছিল না আর, বেলা বারোটার মধ্যে নীচে নেমে যেতে হবে। অতএব এবার আমরা ফিরে চললাম - সঙ্গে দেহাতিনি পশারিনি। Grocery store থেকে মালপত্র pick up করে বাস স্টেশনে এসে দাঁড়ালাম। আসার সময় ৫ ডলার করে দিয়েছি। এবারে সোজা বলে দিলাম Local লোকেরা দেড় ডলার দেয় আমি জানি, তাই দু ডলারের বেশী উঠবো না। সেইরকমই রফা হোল।

একটু পরে ছাড়লো বাস। এবার নীচে নামা তাই চল্লিশ মিনিটের বেশী লাগার কথা নয়। কিন্তু খানিকটা গিয়েই দেখা গেল দুদিকের সব গাড়ি থেমে আছে, রাস্তা বন্ধ ! সামনে নাকি কোন accident হয়েছে। বাস থেকে নেমে সামনে হাঁটলাম মিনিট পাঁচেক। হতাহতের কোনো চিহ্ন নেই। রাস্তার একপাশে মোটরসাইকেলের চাকার ঘসটানো দাগ ছিল। তার উল্টোদিকে রেলিঙের ধারে বিমর্ষ এক তরুণ বসে

আছে, তার সামনে কিছু টাকা ছড়ানো, বোধহয় সমবেদনার দান। ঠিকমতো বোঝা গেল না কি হয়েছে। অগত্যা আমি ফিরে গেলাম বাসে।

যাই হোক, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে রাস্তা খুললো আবার। আরো আধ ঘণ্টা লাগলো নীচে আসতে। অন্য সবাই নেমে যাওয়ার পর বাস আমাদের ভিয়েতনাম-চীন সীমান্তের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেল। ভিয়েতনামকে শেষবারের মত সেলাম জানিয়ে আমরা এগোলাম সামনে।

## Bishnupur – the Town of Terracotta Temples

Dr. Subhash C. Biswas

Bishnupur is a small village town in the eastern state of West Bengal in India. It may not be a well-known name for most people, but its incredible wealth of art and architecture arouse intense curiosity in the mind of informed tourists. Bishnupur has always been a place of much touristic interest, especially for its unique terracotta temples. The fame of India's traditional heritage of sculpture and architecture does not need special mentioning, yet it needs to be said that most of such heritage is seen in marbles and stones. There are numerous places all over India where one can see magnificent monuments with illustrious sculptures and intricate carvings; but again, most of them have excelled in using the same two materials to find artistic expression. Bishnupur is not one such place; it rather occupies a distinctive place in India for its treasure trove of terracotta art and architecture. Not only Bishnupur, whole of Bengal is famous for its marvelous monuments showing excellent terracotta art, as well as for terracotta figurines and ornaments.

### Terracotta and its brief history

The word 'Terracotta' is derived from Italian "*Terra cotta'* that means baked or cooked earth. This material, obtained by firing clay in temperatures of around 1000 degree Celsius, may be produced in various colours, like red, brown, yellow or grey. This versatile material with its ease of production bestowed the human civilization of remote past a great gift of creativity. Terracotta has been an art form since the earliest of times; perhaps it was one of the first artistic expressions of human mind.

Use of terracotta can be traced back to many ancient civilizations. Excavation of various sites of Indus Valley Civilization such as Mahenjo Daro, Harappa, etc., has brought forth artifacts, relics and ruins that reveal startling evidence of use of terracotta dating back to 3000 BC and earlier. Statuettes of Mother Goddess and male gods, figurines, and many more articles can be seen in the showcases of museums of the world. Ancient civilizations of Egypt, Mesopotamia and Greece are also no exceptions. Terracotta was used extensively in those civilizations. Fascinating artifacts bearing testimonies of terracotta arts and crafts from nineteenth century BC have been excavated by archeologists.

## Terracotta art in West Bengal

West Bengal is especially regarded for its rich tradition of art and culture. Terracotta is one art form that has earned this province a unique recognition in India for centuries. It is one key attraction that has drawn tourists to this state from far and wide. Deep inside the rural areas of Bengal, one can come across treasure troves of masterpiece creations, such as the widely popular Bankura horse and numerous small and large items of practical use as well as of decoration. Terracotta art came to Bengal sometime during the sixteenth century, along with some religious influence. In Hinduism, there are five basic elements – earth, water, fire, air and space. These elements found artistic expression in terracotta by virtue of which terracotta acquired some air of spirituality and auspiciousness. Every Hindu family respectfully holds their terracotta possessions with some religious value, especially the earthen lamp. This religious inclination is perhaps one of the reasons behind architectural use of terracotta in building temples. Another obvious reason is the scarcity of stones and marbles in this state. Royal sponsorship and patronization enormously supported the artists and architects in building temples with terracotta, which thus achieved a high status of art form.

## Brief history of Bishnupur

A vast land surrounding Bishnupur used to be known as Mallabhoom. 'Malla' (pronounced '*mall-lo*) means 'wrestler' and 'bhoom' means 'land'. Mallabhoom or Land of wrestlers was named after the Malla rulers of Bishnupur. The Malla dynasty was founded by Raghunath, the Adi Malla or the First Malla as he was called. He was a champion wrestler and was awarded the title 'Malla' by the king of the land. It is believed that the fourteenth king, Jagat Malla, established his capital at Bishnupur. For many centuries, the Malla kings of Bishnupur ruled powerfully and brought prosperity to their kingdom. Even the mighty Mughals could not set a foot hold in Mallabhoom without making some sort of alliance. The forty-ninth king of the dynasty, Dhari Malla, was a powerful monarch who reigned for forty-eight years. His son, Beer Hambeer, was the greatest Malla that ever ruled Mallabhoom. He was a contemporary of the great Mughal emperor Akbar.

Beer Hambeer became a devout follower of Vaishnavism and firmly established this faith in Mallabhoom. The Malla kings after Beer Hambeer were all devotees of Lord Vishnu; so it is believed that the capital of Mallabhoom had been named 'Vishnupur' or 'Bishnupur' by one of the kings. Beer Hambeer, the most renowned among the Malla kings, made the name of Bishnupur famous all over India and beyond. He built a magnificent temple, called Rasamancha, dedicated to Madan-Mohan, a form of Vishnu, and thus established a tradition of temple building that was followed by a succession of Malla kings after him. Bishnupur thus rose to a pinnacle of glory with an assembly of about thirty temples with splendid architectural styles and terracotta decorations. It also earned fame as a center of study of Sanskrit and classical music.

## Visiting Bishnupur

Today's Bishnupur is regarded as a touristic destination especially for its temples. The present author visited Bishnupur during the last winter in the month of January 2016. Although every season has its own charm and beauty, winter seems to be the most convenient time to visit Bishnupur. During this season the town is relatively dry that ensures sunny days. There may be some complaint of dust causing minor problems. Bishnupur is a town located in the district of Bankura that is known as a land of red soil. The greenery of the land remains covered with red dust, especially in the winter. Bishnupur is situated at a distance of about 165 km north-west from Kolkata. Plenty of transport facilities are available from Kolkata to reach Bishnupur, like regular bus, special tourist bus and trains. One can also rent a chauffeur-driven

car; there are good roads from Kolkata to Bishnupur. The main attraction of Bishnupur is obviously its temples where matchless terracotta has found its best expression. Apart from temples, Bishnupur is regarded with high esteem for its great contribution to the world of music. Bishnupur *Gharana* has become a respectable and traditional composition in Indian classical music. This village is also known for its cottage industries, like silk and handicrafts. The people of Bishnupur still hail their town with many celebrations, fairs and festivals awakening reminiscences of its past glory.

We rented a chauffeur-driven car to visit Bishnupur. On our way, we visited Jairambati and Kamarpukur, birth places of Shree Ramakrishna and Mother Saradamayee, two of India's great saints. We reached Bishnupur in about four hours. The quaint village town beckons with its plethora of magnificent temples scattered over an extensive area. Most of these temples are dedicated to Lord Vishnu as it may be expected. Archeological Survey of India has reserved twenty of these temples under their protection and care. As we did not have enough time for all the temples, we selected a few of them to visit. In what follows, we describe them in some detail.

## Archeological style and sculptural art

The architecture of Bishnupur temples may be classified into three major groups of style known as *Deul*, *Chala* and *Ratna*. Temples of *Deul* style are characterized by their single tower structure. This style bears likeness to the much famous *Nagara* style common to North India. There are only a few temples of this style in Bishnupur and most of them are in dilapidated condition. *Chala* style, otherwise known as *Bangla* style of temple architecture, is one that has evolved in Bengal during the medieval time. *Chala* style conforms to the simple domestic architecture of thatched hut, widely prevalent in rural Bengal. The word *Chala* means 'roof'. This style is characterized by roofs that slope on two or four sides. The third style, *Ratna*, has towers that resemble spires having facets. The word *Ratna* means 'gem' or for these temples it means simply 'tower'. Temples of this style are generally characterized by their number of *Ratnas* (towers), such as *Eka-Ratna* or single tower, *Pancha-Ratna* or five towers and *Nava-Ratna* or nine towers.

Apart from architectural splendor, the temples are found to be elaborately decorated with intricate carvings and scrollwork ornamentation. Scarcity of marbles or stones in the area did not deter the artists and artisans of the times; they rather profoundly used their artistic talent to discover innovative ideas for baking tales in clay depicting episodes from mythological epics and everyday social life. This gave birth to a new world of terracotta art that gained fame all over India and beyond. They elaborately carved temple walls, panels and ceilings with geometric or ornamental patterns, floral and vegetal patterns and figural motifs consisting of birds and animals. Each temple they built became an epic by itself telling stories from the mythological period to their present time.

## Temples

1. Shaileshwar and Shareshwar Temples

These are two adjacent temples located in a village called Dihar about 15 km from Bishnupur. These temples, though in a dilapidated condition, are interesting because of their antiquity and architectural style that follows the typical Chariot style of Orissa. They were built by King Prithvi Malla in 1346 AD.

2. Siddheshwar Temple

Another old temple built in the eleventh century AD is remarkable for its intricate carvings in various patterns and motifs. Located in the village of Onda, it is a lofty temple with a height of over 19 m erected on a high platform. It is interesting to note the resemblance of Jain architectural style in this temple, which indicates the influence of Jainism at the time. Idols of Lord Ganesha, Goddess Chamunda and one Tirthankar are visible inside the temple.

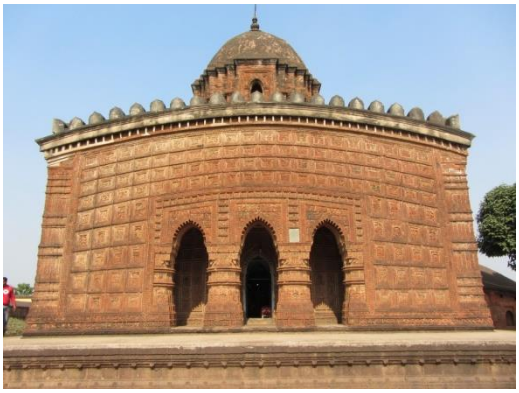

**Madan Mohan Temple**

## 3. Madan Mohan Temple

This is an exemplary temple of *Eka-Ratna* style, built by the fifty-third Malla king Durjan Singha in the year 1694 AD. It enshrines the tutelary deity of the Malla dynasty, Madan Mohan, a form of Lord Vishnu. It has a beautiful tower installed on a sloping roof. The main structure is founded on a high plinth made of laterite. It has a covered porch with three arched openings on three sides. What amazes the visitors most is the extraordinary beauty of the ornamentations that embellish the walls. All the walls are covered with exquisite artwork depicting mythological episodes, stories of Lord Krishna, dancing figures, floral motifs, scenes of war from Mahabharata, animals, plant life and many more, triumphantly and brilliantly displayed. This exuberance of creation eloquently narrates stories of the past to the visitors like a living showcase permanently baked in clay.

In the sanctum, there are idols of Madan Mohan and Radha made of *ashtadhatu* (a composite of eight metals). This temple is still attended by devotees and worshipping is done every day. The attending priest said that all previous priests of this temple had come from the same lineage by tradition and that he too was not an exception.

**Rasmancha**

## 4. Rasamancha

A monument of unique architecture, Rasamancha is one priceless legacy of Malla Beer Hambeer who built this temple in the year 1600 AD. A few architectural styles of choice have been skillfully combined to produce this artistic excellence. Rasamancha has a pyramidal roof placed upon a large square plinth (24.5mx24.5m) made of laterite. The pyramidal roof slopes down to a level where dome-like structures with *chala* style roof are installed on the surrounding edge. Some Islamic architecture is noticed to be beautifully blended with the rest. The sanctum of the shrine is enclosed by three successive circumambulatory galleries with arches. The outer arches are elaborately decorated with panels showing floral motifs and dancing figures. Bloomed lotus, a common symbolic representation of Hinduism, is seen in frequent repetition all over the walls, which convince the visitor that the shrine is undoubtedly a Hindu temple. The arches inside the temple are gateways and there are one hundred and eight of them. Each one of these gateways is named after one of one-hundred and eight names of Lord Krishna. Rasamancha is a wonderful monument of unparalleled beauty. Its architectural uniqueness makes it a pride not only of Bishnupur, but of India at large.

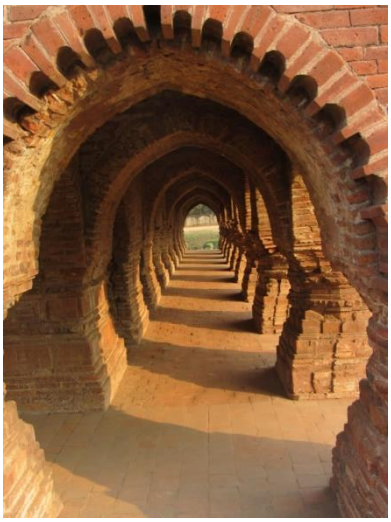

**Arched gateways inside Rasmancha**

## 5. Shyamarai Temple

Built by Malla Raghunath Singha in 1643 AD, Shyamarai Temple stands as the most outstanding among the temples of Bishnupur for its structural configuration and elaborate terracotta engraving. Its char-chala (four-roof) pancha-ratna (five-tower) architecture – so characteristic of Bengal – with the roof sloping on four sides and surrounded by ratnas (towers) at each corner gives it a massive and voluminous appearance. The temple stands on a low square plinth; each of its sides welcomes the visitors with three gateways made of beautifully cusped arches. These gateways lead to a porch in front of the sanctum. A

well-paved circumambulatory path runs around the sanctum. Curved cornices and eaves with friezes are special features of this temple. The sloping roof is also bent in a way so as to easily drain off rain water during downpour that is very frequent in this area during the rainy season. Of the five towers four are square-shaped placed on the four corners of the sloping roof, while the fifth one, the biggest of the five, is octagonal in shape and placed at the centre.

Shyamarai temple is especially remarkable for its high quality decorative panels with terracotta relief, which are seen all over the temple. These panels are installed even on the bottom surface of the arches and on the towers on the roof. The exterior and interior walls as well as the ceiling are embellished with a profusion of exquisite terracotta sculptures depicting stories of Krishna, episodes from the Ramayana and Mahabharata and stories of the socio-economic life of the times. A wide variety of subjects such as geometric patterns, floral motifs, musicians, dancers, plants, animals and grotesque figures are seen in abundance. Shyamarai temple has the most prolific ornamentation that has endowed it beauty and charm beyond compare and has rendered its fame to cross all borders.

## 6. Keshta Rai Temple

This temple is also known as Jor-Bangla or Twin-Bengal temple. Apart from its exquisite terracotta art, this temple is renowned for its unique structural design. It is constructed as two hut type structures, each having two sloping roofs joined together to form a single temple. Built by Malla Raghunath Singha in 1655 AD, Keshta Rai temple is extensively decorated. Terracotta ornamentations such as raised wall-bands decorated with designs of flowers and foliage and lozenge-shaped patterns on medallions are profoundly appreciated by the visitors. A wide variety of scenes from mythology and social life are beautifully sculpted on panels. We spotted one panel that caught our interest. It depicts the great Mughal Emperor Shajahan with a hawk. King Raghunath probably wanted to show respect to the Badshah of Delhi. Richness of imagination demonstrated by this temple and its quality of workmanship have made it the finest among the temples of Bishnupur.

**Shyamarai Temple**

## 7. Radha-Shyam Temple

This is perhaps the last temple of the Malla dynasty. It was built in 1758 AD by the fifty-sixth Malla Chaitanya Singha. History took its toll as the Nawab of Bengal got defeated by the British in the battle of Palashi in 1757 AD. This infamous defeat made inroads for the British into India. One of many unfortunate consequences of this defeat was the fall of the kingdom of Bishnupur. Chaitanya Singha was

a popular and powerful king; he managed to maintain independence for a while and to build this temple overcoming many hurdles including financial difficulties. But at the end, he also fell under the victory march of the British and his kingdom got reduced to a mere Zamindary (landed property).

This temple, built with laterite, stands within a large enclosed courtyard. It is especially known for its stucco relief. In the sanctum, there are idols of Radha, made of *Ashtadhatu* (eight metals) and Krishna (Shyam), made of touchstone.

There are many more temples in Bishnupur worth visiting. Of these, one temple is especially noteworthy, Mrinmayee Temple. This is the very first temple of the Malla dynasty built in Mallabhoom.

## Carvings on Shyamarai Temple

It was built by the nineteenth king Jagat Malla. Bishnupur, although a village town today, is a wonderful place to visit. It still stands proud and brilliant with its colourful history embodied in magnificent monuments. It welcomes and enthralls its visitors with many showcases that bring to life glimpses of glory of its palmy days. History follows its own course with indifference, taking down kingdoms and giving rise to new ones. But the ruins left behind on its course wait eternally to tell their stories to whoever has the patience to listen. We listened to the stories of Mallabhoom through its splendid temples narrating eloquently the history of over one thousand years of reign of the Malla dynasty. Enjoying great art is not only uplifting for the soul, but it also enlightens the mind and refreshes the body by alleviating the exhaustion from travel. Bishnupur has opened to us a new chapter of history and has given us a memorable experience.

********** (((((((((((((((((( ))))))))))))))))) **********

# Himachal Pradesh II. Shimla Where Rhododendrons Bloom

Dr. Subhash C. Biswas

A picturesque resort in the midst of mountains covered with dense woods of deodars, oaks, pines and rhododendrons is doubtlessly a desirable place to be in and to enjoy the nature on high altitude. Godadhar and Kamalika have just got the opportunity to experience such a delightful sojourn.

“Just a glance of these wonderful sights is enough to drown me in a sea of indescribable beauty,” says Godadhar with a tone heavy with humbleness.

“I can only say I’m totally lost in in the mountains,” says Kamalika who has just got her dream fulfilled.

They are now ready for the next day’s program to visit Shimla town. Spread out on top of seven hills in the south-western ranges of Himalayas, the capital city Shimla with an altitude of over 8000 ft. is unquestionably one of the most spectacular hill stations of India. Once again, they are encountering the same thrilling drive from hotel to the city of Shimla. Hilly roads meandering through magnificent deodar forests bewilder the travelers with sudden strokes of adventure and fright. But Lelay’s expertise in driving leaves no scope to feel worried.

Looking at houses on wide, steep slopes all over the city and around, Godadhar wonders if they are structurally solid and resistant against earthquakes. These houses look so unstable that it seems they will roll down the hill by the strike of a single jolt.

“Do these houses break down often, Lelay?” Godadhar inquires.

“No Sir, they don’t. They’ve a solid architecture. I worked for construction many years, Sir, I know.”

“How do you build them on this kind of slopes?”

“Here in this region of Himachal Pradesh, our method we call ‘Kathkuni’. It’s very popular here. We first build a mesh of interlocking deodars and then pack it with raw stones. Deodar poles are very strong and they hold firmly against earthquakes.”

“And then there’re European styles of architecture too, isn’t it?”

“Yes Sir.”

“I wonder how you build on seemingly insurmountable sites.”

“Special, Sir, Hill Architecture.”

“You seem to know a lot about Himalayan architecture, Lelay.”

“A little, Sir.” Lelay glances back with a shy look and a grin that tells of a bit of embarrassment.

“Where are you taking us first?” Kamalika changes the topic.

“Ma’am, you’ll visit the famous Hanuman Temple first.”

“The hills and valleys of this region are full of rhododendrons. Do you do any festival with them?” Godadhar asks gazing at rows of rhododendrons.

“No Sir, not exactly; but we like them so much that we eat them and drink their juice.” Lelay’s face glows with delightful laughter, as if he is just enjoying rhododendron fest. “We call these flowers *brans*,” he continues. “We make jam, jelly, juice, squash, and more with them. You know Sir, these flowers have lot of medicinal values; so there’s a huge demand.”

“I must taste rhododendron juice; can I buy it in stores here?”

“Yes, Sir.”

Hanuman Temple

Ambling through narrow roads of Shimla city, they come to a point from where it is a steep climb with a few sharp bends to reach Hanuman Temple. Some people climb on foot, some ride on pony or horse, and others on taxi or their own car. The Temple is situated on the peak of Jakhoo Hill, the highest peak of Shimla, at a height of approximately 2469 m (8100 ft.). The actual temple is a small, ancient shrine surrounded by murals of Lord Hanuman performing episodic feats from the Ramayana. Legend has it that this shrine contains the *Paduka* (wooden sandal) of the ascetic who founded it and then vanished. Although small in size, it is huge in spiritual values and highly revered. Devotees throng in big numbers to pray to Lord Hanuman.

“Sir, beware of monkeys, they can be a menace,” cautions Lelay.

“Thanks Lelay, I see hundreds of them here,” says Godadhar with a watchful look.

Yes, monkeys are loitering around here in big numbers, may be surpassing the number of humans. It is amusingly appropriate as the temple is dedicated to the Monkey God. There are signs advising the visitors to secure all personal belongings from the omnipresent macaques waiting for their chances.

Getting on the top of the hill what catches the eye is a gigantic statue of Lord Hanuman. Standing 108-ft. tall on the highest peak of Shimla, this immense idol overlooks the entire Shivalik ranges and Shimla city, and boldly announces the new height of religiosity. This statue was built only recently, in 2010. This peak offers a splendid panoramic view.

**Statue of Hanuman on the peak of Jakhoo Hill**

“I’m sure this must be the tallest statue of the world,” says Kamalika.

“Tallest Hanuman statue I guess, I don’t know of any other statue as tall or even nearly.”

“There’s one nearly as tall in Maharashtra,” says someone standing nearby. A middle-aged gentleman with a bright, smiling face approaches Godadhar. A vibrant three-line *Tilak* (mark of sandal-paste) on his broad forehead proudly announces his strong religious faith. “Excuse me please for interrupting; my name is Hanuman Sharan, a businessman and a *Sevaite* (Servant of God), and a frequent visitor here.”

“Glad to meet you; but how high is that statue, the one you just mentioned?” asks Godadhar.

“It’s 105-ft. high, called *Hanuman Murti*. But this one is not the tallest in India.”

“Is there a still taller one?” Kamalika shows curiosity.

“Yes, Madam; the tallest one stands at a staggering height of 41 m or 135 ft. It is in Andhra Pradesh.”

“That’s a colossal one,” says Kamalika with a tone of astonishment.

“And the colossal one has a befitting name too, and that is *Veera Abhaya Anjaneya Hanuman Swami*, meaning Lord Hanuman, the heroic fearless son of *Anjana*.”

**Temple on the top of Jakhoo Hill**

“You sound like an expert of Hanuman statues,” says Godadhar with a smile of appreciation.

“I can accept the certification. I can give you the full list of tall Hanuman statues of India. I’m a Hanuman devotee and my name is Hanuman Sharan.” Mr. Sharan laughs open-heartedly.

Kamalika becomes restless noticing a few monkeys surrounding the trio and making postures.

“They look scary, what do they want?” Kamalika quickly moves close to Godadhar.

“Don’t worry Madam; they only want a share of whatever you have as food and they’re very persistent for it.”

“Should we share?”

“Share you may, but dare you not.” Mr. Sharan laughs again feeling gratified with his poetic reply. He then picks up a stick and drives the monkeys away. “You know Madam, when you offer food to one, dozens will gather around you.”

The popular belief is that Hanuman stopped on this peak to rest for a while on his return from Lanka. He had the mountain *Gandhamadan* on his hands. He was going back to place the mountain in its original site after he had revived Lakshmana with the help of the medicinal plant, *Vishalyakarani*, that grew on this mountain only. Legend has it that the peak of this hill got flattened due to the immense weight of Hanuman carrying *Gandhamadan*. It is also believed that the temple has been built on the area containing the footprints of Hanuman.

On the way back, Godadhar notices a small shop selling rhododendron juice.

“I must try that juice; it’s so appealing and exotic, both the flower and its juice,” says he. “Can we stop there, Lelay?”

But Lelay discourages Godadhar. He doesn’t trust the water being used for making juice in that vending outlet. Godadhar understands; everyone must be extra careful for drinking water anywhere in India. The next stop is Shimla’s most attractive point for tourists, the grand Viceregal Lodge, a historical and prestigious institution that is still standing on the summit of the Observatory Hill with glamour and scholarly pride.

Vice-Regal Lodge

The Viceroy of India, Lord Duffrin, wanted a summer capital; he got one built in Shimla. The chosen site was the summit of the Observatory Hill, the second highest point in Shimla after Jakhoo Hill. Surrounded by immaculately maintained gardens, the Vice-Regal Lodge, now known as Rashtrapati Niwas, is a historically significant and architecturally impressive building. The panoramic views of the peaks and valleys of Himachal Pradesh as seen from this hill top are breathtakingly beautiful. After independence, the Lodge became the summer retreat of the President of India. But in early 60’s, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan and Pundit Jawaharlal Nehru together decided to convert it to an academic institution where the best minds would find an ideal retreat. The Indian Institute of Advanced Study moved in the Lodge in 1965. Tourists are welcome to visit the building daily, but only the entrance hall and parts of the ground floor covering a few staterooms are open to the public. A guided half-hour tour covering the historically important parts of the building is offered for a nominal fee.

Both Godadhar and Kamalika walk around in the premises of the Lodge, while waiting for the tour to begin. Standing at a spot of their choice, they look at the gardens, they look at the mountain ranges that surround them and then they look back at the immense architectural wonder shining with historical glory.

“It’s wonderful,” says Godadhar. “The beauty amazes me profoundly.”

“Look at those plants in this garden,” exclaims Kamalika surprised with an unexpected sight. “They’re wisteria, aren’t they?”

“Sure they are and very unexpectedly so. We’re not in Paris, or are we?””

“They remind me the famous painting of Claude Monet. The wisteria plants have created some exotic appeal.”

“I think we should move to the front porch; the next tour will begin soon.”

**Vice-Regal Lodge on the summit of Observatory Hill**

Tourists have already gathered under the portico in front of the entrance gate. There're still a few minutes left for the door to open. All are clustered in the middle of the porch, except one lady, apparently the only foreign tourist, who is standing all alone in a distant corner. Kamalika suggests they should go to her and give her company; her face tells she is confounded.

"Are you waiting for the tour of this building, Madam?" Kamalika asks with a graceful smile.

"Yes, you too?" replies the lady in heavily accented English.

"Yes, us too," says Godadhar coming closer. "Are you from Germany by any chance?"

"Yes I'm and by all chance," the lady says with a lively laughter. The tall slim-built woman in her late forties seems to have regained her normal form. She is quite jubilant and eager to talk. "But how do you know I'm from Germany?"

"I've a few German friends and also can speak *Deutsch* a little," says Godadhar. "I guess you have some mission apart from just visiting; it's an intuition."

"Very intelligent guess. Yes, I've a short fellowship in this Institute of Advanced Study which I'm going to start soon."

"What's your project?"

**Teak wood paneling inside the Vice-Regal Lodge**

"My main interest is about one of India's outstanding personalities, Pundit Nehru, who steered India in the most progressive direction. I want to study him on the perspective of history, tradition and culture. What amazes me most is India's tenacity to survive and progress despite all adversities. Traditionally Indian people highly respect spiritual values and education. The best example of this is this very Institute that was otherwise a practically unproductive showpiece, a summer retreat for high officials."

“I deeply appreciate your understanding, Madam.”

“Norah, my name is Norah; I’m from Dusseldorf.” Grand gesture of friendliness springs out of the meeting of strangers and the moment becomes memorable.

The door opens and the party moves in. A young man shows up and welcomes the visitors into the reception hall.

“Hello everyone, my name is Jitender Singh; I’m an MBA student, now working on a project in this prestigious Institute. I welcome you all. Today, I’m your guide or preferably, you can call me your escort for this short tour. ----“

This Scottish baronial edifice was designed by British architect Henri Irwin using a blend of Jacobean and Elizabethan styles of architecture. Its construction took about eight years to complete, from 1880 to 1888. Lord Duffrin, for whom this lodge was constructed, occupied it on July 23, 1888. The hall is gorgeously decorated with impressive teak paneling. The view while looking all around reveals the opulence of the original design. A grand staircase, ornately decorated, springs from the right and spirals up three floors. Mr. Singh says when the Vice-Regal Lodge was completed, it was not just an architectural marvel, it was a shining example of technological supremacy in those days of the Victorian era. It was well equipped with the facilities of comfort living. For instance, there was a complex plumbing system that provided both hot and cold water, and there was a hidden steam generator that produced electricity. He points to a wall that is still draped with original electrical lines. He leads his visitors to the state drawing room, to ballroom, and then to the dining room that is also teak paneled and decorated with coat of arms of former Governor-Generals and Viceroys. This Lodge was the venue for many important meetings and conferences that set the destiny of the sub-continent. One that comes in mind is the famous Shimla Conference of 1945. Mr. Singh points to a round table surrounded by a few chairs. This is where the leaders executed the most difficult act of partitioning India in 1947. *Godadhar stares at the celebrated round table that is still grieving like a wounded soldier after witnessing helplessly the fragmentation of a great country. It quietly gazes at its visitors telling them of the pathos in silent soliloquy*. The Lodge is now a renowned Institute of advanced study, Mr. Singh continues. Very recently, on the 150$^{th}$ Birth Anniversary of Rabindranath Tagore, Government of India awarded the Tagore Centre for the study of culture and civilization to this Institute.

The half-hour tour ends in exactly half-hour, every minute of which has been worth spending. Lelay comes forward to escort his passengers to the car.

“Did you enjoy this visit, Sir?’

“We did indeed,” responds Godadhar. Then turning to Kamalika he continues, “This is an extraordinary site where quest for knowledge, history and unparalleled beauty have combined giving rise to a hilltop spectacle that excels to a new height.”

“I would simply say this is sightseeing at its best and that says it all.”

“Now what’s our next destination, Lelay?” Asks Godadhar.

“Museum, Sir, the State Museum of Himachal Pradesh. It’ll take a few minutes only.”

**A partial view of Shimla from Observatory Hill**

## The State Museum

From the parking lot, it takes a stiff walk up to the flat ground where the Museum is located near the telecommunication mast. The museum is housed in an old Victorian mansion that has been appropriately altered and adapted for it. This building has some mentionable history behind it. It was once the residence of Lord William Beresford, Military Secretary to the Viceroy, and then of Lord William Bentinck, Governor-General of India. After independence, it continued to serve as residence of high officials of Government of India. In 1974 on the republic day, this building in its present form was opened to public as Himachal State Museum.

The museum is home to an impressive collection of artifacts from ancient and modern times and of magnificent miniature paintings of Northern India in its pristine form. The *Paharhi*, *Moghul* and *Rajasthani* miniature paintings make a remarkable impression in mind. A few contemporary paintings display some of the most picturesque scenes of the Himalayas; they are sure to make a mark. The museum also showcases exquisitely carved stone sculptures dating from second to fourteenth century, bronze idols as well as arms and weapons of historical significance. The interesting collection of Himachali dolls is a unique possession of the museum. This museum housed in a two-storied building is small in size but rich in content; it is sure to impress any visitor.

“I find this museum very interesting, compact with artifacts that are well displayed,” says Godadhar while getting back to the car.

“The walk-tour inside was quite pleasant and refreshing, intellectually,” says Kamalika. “No rush, no crowd, stroll relaxingly.”

“It’s a good museum,” Lelay joins in the conversation while opening the car doors. “But not many tourists come here. Now I’ll take you to a place that nobody forgets to visit.”

“What’s that place, Lelay?” Godadhar asks curiously.

“It’s Mall Road, the Ridge Road, Scandal Point and the Christ Church.”

“That’s more than one place, Lelay,” Godadhar says with a chuckle.

“Yes Sir, in one place all together,” Lelay laughs innocently.

“How far is it?” Kamalika inquires.

“Very close Ma’am, only 2 km or little more.” Lelay seems to be in jolly mood; he hums a *Paharhi* tune that smoothly mingles with the inaudible melody prevailing in the mountainous surroundings and the far-off snow-clad Himalayas.

“It’s a sweet tune you’re humming Lelay,” Kamalika says with a tone of appreciation.

“Thank you, Ma’am.” Lelay glances back with the same shy smile that often flashes on his face.

## Mall Road and Scandal Point

Mall road is the main road in Shimla, where most of the marketing facilities such as, Municipal Office, Police headquarter, and fire station are located. No automobiles are allowed on this road; so it has become an ideal street to stroll at ease and shop. Throughout the day and the evening, this road remains lively with tourists as well as the locals. There are department stores, restaurants, cafes and other shops here. So it’s a place where one can spend the whole day, leisurely.

Ridge Road is located at a higher level than Mall Road. Scandal Point is a small area located near the point where these two main roads of Shimla converge. This is a lovely little spot, but it acquired the bizarre appellation of Scandal Point because of a scandalous occurrence that took place in this area. A Maharaja of Patiala had some affair with a daughter of a British Lord and they eloped together. This elopement took place at this point. As a consequence, the Maharaja was banished from entering Shimla by the British authorities. This story has only loosely based facts.

“The scandal story has some flaws,” says Godadhar.

“What makes you say so?”

“Look, the time when the scandal took place was 1891 to 1892, and the scandal was attributed to Maharaja Bhupendra Singh who was just a baby then.”

“That’s not a problem for the story. If the baby didn’t do it his father must have done it,” Kamalika responds with a chuckle.

“Right, right indeed Malika,” Godadhar laughs aloud. “Although your response comes from baby-book stories, you’ve plucked the right string.”

“What do you mean?”

“Some people really think it was his father Maharaja Rajendra Singh. It may as well be true, because he had an English wife.”

“Why is the scandal imposed on the innocent baby?”

“Because, it makes some sense. Bhupendra was a very handsome, charismatic personality and had the reputation of being a womanizer, a playboy. He also had many wives. So he had all the ingredients for such a scandal.”

“You mean to say he inherited the scandal, right?”

“Yes, in grand Maharaja Style.” Godadhar laughs again. Then turning around he says, “Look Malika, there’s a statue of Lala Lajpat Rai, the great freedom fighter.”

“What scandal did he do?” Kamalika asks sarcastically.

“May be he is a scandal redeemer. I think, this area should be renamed as Lala Lajpat Rai Square, I’m serious.”

Lelay approaches towards Godadhar. “The Christ Church is just there, you must go to visit,” he suggests.

“Yes, I can see it. It stands out.”

## Christ Church

The inviting afternoon sun is shining magically on the yellow outer walls of the Church. In the front area of the Church, throngs of visitors are passing to and fro. Kamalika and Godadhar stroll towards the Church.

“Look at the Church, Malika! It’s glowing so beautifully; it’s amazing,” says Godadhar gazing at the Church with amazement.

“It’s wonderful, really something not to miss.”

Christ Church is an important landmark of Shimla and the most prominent building in the area. It is reputed to be the oldest church in Shimla and the second oldest in Northern India after St. John’s Church in Meerut.

This Church was designed in Elizabethan style with neo-gothic elements by Colonel John Theopolis Boileau in 1844 and consecrated in 1857. The clock, one of the prominent features of the Church, was donated by Colonel Dumbleton in 1860. The original stained glass windows, for which it was so famed, are still charming visitors with their shine and glamour. There are five in all, of which one is to be noticed with some attention, one that depicts the virtues – Faith, Charity, Hope, Fortitude, Patience and Humility. The pipe organ, installed in 1899 replacing the original one, is also reputed to be one of the big ones of the country.

Godadhar and Kamalika enter the Church and sit on a bench in meditative mood.

“It’s so peaceful here,” softly utters Kamalika.

“Although architect Boileau was a Colonel, he never fought a war and retired as Major General. He was a good architect for sure; he had many famous designs to his credit, including repairs to Taj Mahal. I read an article on him.” Godadhar pays homage to Colonel Boileau.

“I had no idea; he must have been a famous figure as this Church stands as evidence.”

“And interestingly enough, there’s a Kipling connection with this Church. Its chancel window was designed by Lockwood Kipling, author’s father.”

“Sounds amusing. What else do you know?”

Lelay suggests it is time to go back to the hotel and not to forget the drive through the deodar forests. He also says the Church looks absolutely glamorous in the night when it is illuminated with colourful lights.

“So let’s go back; we’ll have to miss the golden opportunity to watch the Church glowing magically in the night,” says Godadhar while getting up.

The day’s exhaustion is taking its toll; both of them feel tired while riding back to hotel. Godadhar suddenly straightens up on his seat as if he has remembered something.

“Lelay, I’m going to miss the colourful show of the Church at night; but I don’t want to miss my rhododendron juice by any chance,” Godadhar says jokingly.

“No Sir, you’ll get it; not today but tomorrow.”

“But we’re leaving Shimla tomorrow morning.”

“No problem Sir, you’ll get it elsewhere.”

After getting in their room in the hotel, they drop their tired bodies on a couch.

“Should we order for coffee now?” Kamalika wonders.

The doorbell rings. Godadhar opens the door and there is Gitaram with a full blown smile along with someone behind carrying a tray of coffee and some snacks.

“Hi Gitaram, nice to see you again.”

“Good evening Sir, you can call me Gitu, I hope you enjoyed the day’s trip.”

“Yes Gitu, but I didn’t order for coffee yet.”

“On the house, Sir; please enjoy. I ordered for the coffee soon after I spotted you in the parking lot.”

Gitaram doesn’t wait for a request to take a place; he sits on a sofa unhesitatingly. He somehow feels sure he has got a soft corner in the heart of this old couple. Godadhar too has developed some unusual affection for this young *Paharhi* chap within this short duration. He likes Gitaram much more than any stranger he liked ever before.

“Gitu, tell me more about Himachal, *Devbhumi*.”

“Yes Sir, as I told you, there’re many archeological artifacts hidden or buried in these mountainous jungles. My grandmother knows where they are; me too, I also know some.” Pointing to a mountain peak, Gitaram continues,” Not too far from here, there’s a stone statue of Arjun with bow and arrow in launching posture. But going there wouldn’t be easy for you, unfortunately. There’re many temples though in Himachal, which you probably have in your itinerary. ---“

“Have you informed the Archeological Survey of India about these hidden treasures?”

“I haven’t, but others have. I believe some day they’ll come with their tools.”

“How’s is your grandmother, Gitu?” Kamalika asks.

“She’s fine and active. She never rests. I’ve told her about you and she’s very curious to see you. Next month my sister Sumana is going to be married. Grandma has asked me to invite you. Will you come?”

“Tell her it’s not possible; convey our polite thanks and warm regards for her. We feel honoured.”

“I sure will; but you must come to my marriage, next year. You come to New Delhi and then the rest is on me. I’ll be very happy if you can make it,” Gitaram says with a cordial smile and his obvious Himachali pride.

“Congratulations in advance, we’ll surely give it a serious thought. We’re very happy and glad with this good news of your and your sister’s marriage.”

“So good night for now, I’ll see you tomorrow morning before you leave.”

The night passes on and the day dawns with colourful glow behind the mountains. Now is the time to leave this place and move on to the next. After breakfast, both Kamalika and Godadhar gather in the

lobby. Lelay suddenly shows up from nowhere with a wide smile wishing good morning. He looks quite bright and sprightly and ready for the long drive. Godadhar seems to have fallen in love with this place; departing is heart-rending. He hesitates to move; but Kamalika steps forward asking him to follow.

“Good morning Sir, Madam.” Gitaram comes forward with open-hearted greeting. He has a gift bag in his hand.

“Good morning Gitu, I’m glad to see you again,” says Godadhar delightfully, as if he has been waiting for him. He advances to shake hands with Gitaram.

“Here is a small gift for you – a jar of rhododendron jam and a jar of rhododendron chutney. My mother has made them following a recipe of my grandmother – a genuine traditional home-made goody. Our whole family will be obliged if you kindly accept.”

“It’s a great pleasure, Gitu. We surely accept. But how do you know I’ve been looking for some rhododendron product?”

“I must confess I had a talk with your driver, Lelay.” Lelay chuckles standing at a distance.

“Our heart-felt thanks for your family, especially for your mother and grandmother. This is a great gift, most precious and delicious. It will remain in our memory as a souvenir forever.”

The car starts to move. Gitaram waves his hands; Godadhar looks back as long as he can be seen.

# Cleopatra in Acrylic

Arun Shankar Roy

# Life on a lilypad

Reeto Ghosh, Grade 7

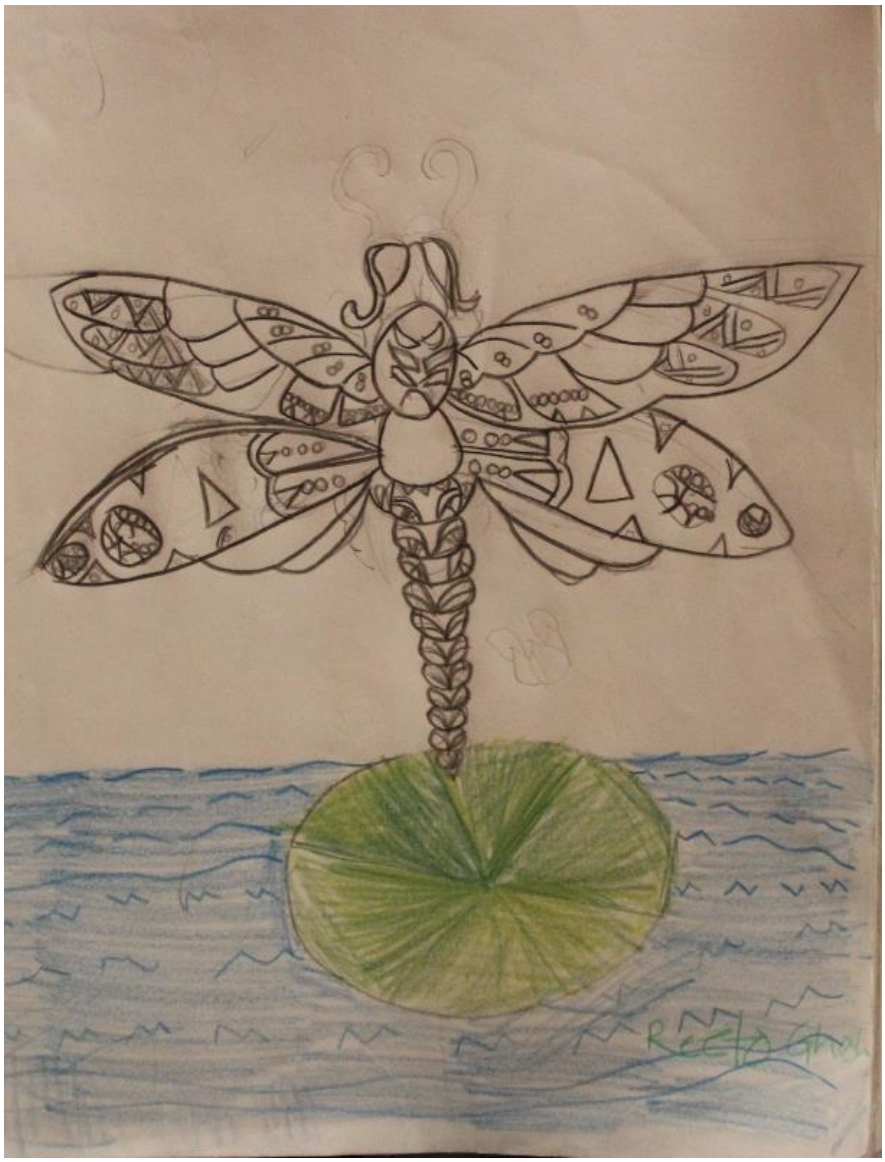

# A Collage – Travel Moments in Time!

## Aditi Chakravarty

Being an ESL teacher, it has always been my dream to visit different countries on teaching assignments. One of the countries I'd always wanted to visit was China. In school, we had learnt about the Great Wall of China and when the opportunity actually presented itself in the form of a summer assignment, I could not resist myself from accepting. It would be three weeks in a country that has interested both scholars and the common man alike! This experience would actually prove if I was a good communicator, not just a language teacher.

A group of 12 professors, consisting of six from the Language Institute, two from the Business School and four from the Hospitality and Tourism school were selected. However, we were neither travelling together nor were we going to the same cities. My colleague, Susan and I would be travelling to Shenyang, the capital of Liaoning province. With three weekends there, we'd made arrangements and booked travel tickets to Shanghai and Beijing while still in Ottawa.

Flight from Toronto to Shanghai

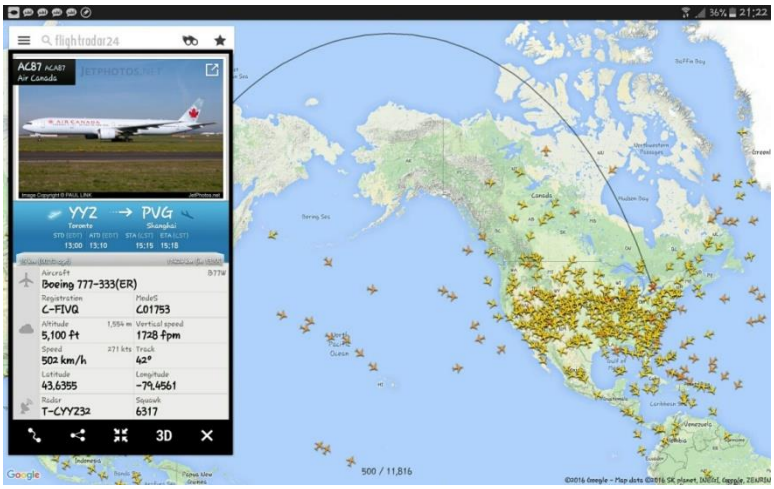


The actual flight plan

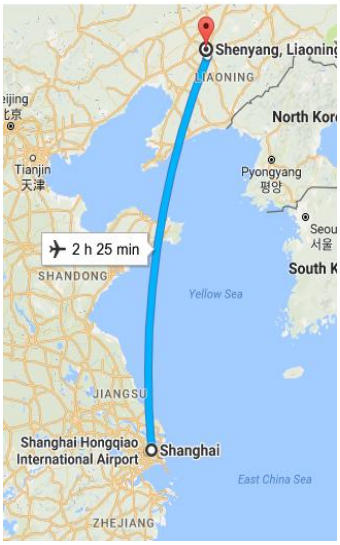


Flight from Shanghai to Shenyang

Before leaving for the trip, everyone warned us about the “Great Firewall of China” that blocks, restricts and monitors all means of communication through the internet. We all made adequate preparation. I, on the other hand thought, a few days without internet would be just fine. Moreover, whatever free time I had, I could utilize exploring places! This was something I regretted later!

On April 30th, 2016 we boarded the Air Canada flight – Ottawa – Toronto – Shanghai. It has always been my habit to check what air spaces I will be flying over. In short, my route map. This time, however, it was a busy week at work until Friday and then flying out on Saturday morning! I did not have time to breathe or relax and continued to remind myself that I will have a lot of time to sleep on the flight. It was an uneventful one hour flight to Toronto.

Our flight onward to Shanghai was at 1 pm, so we had enough time to have lunch and look around. It felt a little weird, being around with someone I met only a few times at work. But we had had a long discussion at work before our journey, and both of us understood the meaning of privacy and giving each other space!

I had never travelled over the Pacific Ocean. So this flight was going to be different. As soon as we entered the plane, it felt like what we would be feeling for the next three weeks. Being in China! The entire plane was full of Chinese students returning home for the summer!!! Susan settled down in her aisle seat and I comfortably snuggled in in my window seat. As it was a day flight and we were travelling to the west, we would have sunlight throughout our journey. That was new to me as I had always travelled at night.

Everyone slept throughout the flight or waking in between for food and drinks while I watched movie after movie and sometimes opened the window shutter, to everyone’s frustration, to have a peek outside. At first it looked like it was winter! But wait a minute, it’s summer now!!! A few hours later the land mass outside looked like the arctic region!!! Why are we going north??? Are we on the correct flight? I asked the flight attendant and she said it is the shorter route. It is called the Polar Route. Shorter distance travelled means cheaper flights!!!

The icy North Polar topography

Glacial Rivers as seen from the plane

The icy horizon

The sights outside the window blew me away - icy glacial rivers, the white mass of ice meeting the blue sky! The horizon looked magnificent! Unfortunately, I did not meet Mr. Santa Claus! The rest of the flight was ordinary.

Our flight landed at 3 pm in Shanghai. Both of us were excited – we were on the other side of the globe. The thought of being in a country that I had heard of, read about in books or watched on TV was thrilling! But I already missed home!

Whatever happened next should be a reminder to all travellers to be careful in hiring taxis at international destinations. Susan wanted a puff of smoke before she got a taxi to the hotel, so we walked outside the terminal with our luggage. As we waited in the smoking zone, Susan made friends with one of the Chinese airport officials and he offered to help us find a taxi. And in my mind I thought, this is not right! He will rip us off! That was exactly what happened. ¥350 for a one way ride to our hotel!

The hotel was very mediocre. This is what we could afford at $65 (USD) a night as we were paying from our pockets for the first night. We shared the room for the night! It was a bad idea because the floors creaked!

We were both tired after the long journey and the bed looked very inviting. Susan changed and went to bed! But I had to have dinner before going to bed. I went downstairs to the restaurant. It was crowded just like in India. Everyone spoke Chinese; not a single word of English. And to top it off, Google translate did not work!!! The final resort was Baidu, the equivalent of Google in China. There were big families sitting around round tables with big meals and a few couples. I was the only person sitting single at a table and everyone looked strangely at me. As an Indian, I thought I would manage with the glares but it was too prying. I managed to order and have some pork soup and steamed bread rolls.

The following morning Susan was doing a bike ride around Shanghai and I was travelling to Suzhou – Zhouzhuang. At 9 am my guide met me downstairs at the hotel lobby. A young Chinese lady in her 20s – Martina. It was a lovely trip around the ancient cities.

A few pictures from the Suzhou – Zhouzhuang trip with my guide Martina

It had rained the whole day and I was late returning to the hotel. By the time I got back, Susan had returned and was out having dinner in one of the shacks outside the hotel. I joined her as well. There were different types of meat, fish and veggies on skewers for barbeque. I had a few barbequed vegetables and chicken skewers. We had to pack for the flight to Shenyang for the following morning, so we hurried through dinner.

The next day we were ready quite early. We checked out of the hotel at 6 am and headed for the airport in our pre-booked taxi. This time we were not being fooled! The fare was only ¥144!!! Both of us laughed! It was a lesson learnt!

The flight was turbulent and some of the passengers were scared. This time both of us were wide awake throughout the flight. Finally, we landed safely in Shenyang! Our guide, translator, friend, handler would be Yuki Xue from then on. She is the Program Manager, International Education School at the vocational college we would be teaching.

During the next few days we were immersed in work – lesson plans, teaching, tests and corrections, and of course bonding with our students. Two days in China and I realized and regretted not buying a VPN while in Canada. I could not live without Google or Facebook! I, therefore, had to buy a VPN!!!

Yuki, Susan and me at the Imperial Palace, Shenyang

With my students

The following weekend, we had planned to go to Beijing to visit the Great Wall, Forbidden City and Tiananmen Square. It would be our first ride on the famous bullet train. The speed blew us away!!! At 307 kms per hour, we were almost flying!

Our hotel was Crowne Plaza at Beijing, very close to the Forbidden City and Tiananmen Square. The receptionists spoke English to our surprise! It was amazing to communicate with someone who spoke the same language. What a relief! We were shown into our wonderful rooms after a long train ride. Both of us were excited. The next day would be an interesting one – visiting the Great Wall!

The following morning we had a sumptuous breakfast at the hotel before we left for our day long trip. We were greeted at the lobby by our travel guide for the day, Adele - another young lady in her 20s. The next few hours were like a flash of beautiful sights, sounds, food, music, people, history and architecture.

Climbing the Great Wall was tiring and needed a lot of stamina. I am someone who hardly ever exercises and this climb tried my fitness level! Sometimes the steps were small and at other times they were so huge that I had to sit on them to actually climb it. I was so scared of the height that I did not let go of the railing on the side at any time. However, at one point I realized that I was climbing alone and Susan and Adele had stopped a few steps below. I was tired too but I had to do this. This might be the last time I will be visiting this ancient monument, one of the Seven Wonders of the World!!! So I did and climbed until the highest tower!

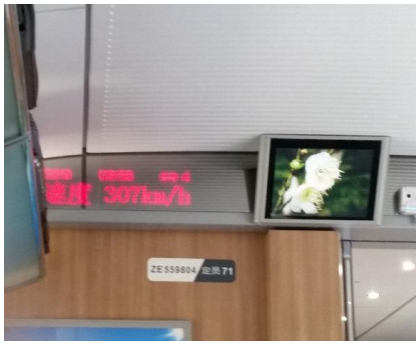


The speed dashboard on the bullet train

The Great Wall of China – “I climbed it!!!”

The sights and sounds of Beijing – Tiananmen Square and Forbidden City

The Empress!!!

The rest of the week was kind of quiet. We moved around the city, trying to take in as much as we could of the local parks, markets, travelling by bus to downtown Shenyang.

Parks, art work, food – letting loose of the child in me!

The following weekend was the last one we would be spending in China and we had nothing planned. Incidentally, we met Shawn in Shenyang, teaching at the same college. He is a TESL student from Algonquin College, completing his practicum at an international school. Three of us decided that we should do something interesting. After some research, we decided that we would be going to Dandong, a Chinese city at the border of North Korea, visit the far eastern end of the Great Wall of China – the “Hushan Great Wall” and visit the Imperial Palace in Shenyang – the “Gugong”.

It was an absolutely different experience. The Yalu River divides China from North Korea and the difference can be seen clearly – on one side of the river there were tall buildings, while on the other it was barren. We could see a deserted park and a ferrous wheel that stood still. At certain intervals we could see guards doing their rounds and we were asked not to stare or look for too long. The feeling was very eerie.

Yalu River – Broken Bridge, Dandong

Gugong – The Imperial Palace, Shenyang

It was finally the last week in China. By this time, I longed to be back home with family and friends. However, I still had five working days before my return flight on May 21st, 2016. The week flew in a jiffy and my students fared well in their exams and presentations.

The final day of class – presentations and exams!

With my luggage all packed and a quick handover to the next team of teachers at the hotel, my assignment was complete. On Saturday, Yuki bid me farewell at the airport. For three weeks she was with us – I promised that I would keep in touch with her and would return next year if I am selected!

On the flight back to Ottawa via Tokyo, I sat quietly beside a Canadian couple. When they said “Hi”, I was quiet for some time before I greeted them. They were a little surprised and asked me if I was okay. But the truth was, I was taking in the feeling of being in an environment where people spoke the same language as me and I could understand everything that they said!!!

This trip was a fantastic experience, one that I will remember for a long time! A check mark on my “Places to visit in this lifetime”. Done!

# Mer Bleue Bog

Tanima Majumdar

# Remembering Harambe

Reeto Ghosh, Grade 7